কৃতিত্ব — প্রশ্ন সংকলন

বাংলা ২য় পত্র

MCQ

বিষয়
বাংলা ২য় পত্র

অধ্যায়
সকল অধ্যায়

প্রশ্নের ধরন
MCQ

মোট প্রশ্ন
২৮৫

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৮৫ × ১ = ২৮৫

ভাষা ও বাংলা ভাষা

১. ভাষার মূল উপাদান কী? [য. বো. ১৩]

(ক) পদ (খ) বাক্য
(গ) শব্দ (ঘ) ধ্বনি ✓

২. বর্তমানে পৃথিবীতে ভাষা চলিত আছে— [কু. বো-১১, সি. বো-০৮, ০৪]

(ক) দুই হাজার (খ) পাঁচ হাজারের ওপর
(গ) সাড়ে তিন হাজারের ওপর ✓ (ঘ) সাড়ে সাত হাজারের ওপর

৩. 'তজ্জাতি' শব্দের উদাহরণ কোনটি? [দি. বো-০৯, য. বো-০৬, ব. বো-১১]

(ক) হরতাল ✓ (খ) লুচি
(গ) রিক্সা (ঘ) চাকু

৪. কোন ভাষারীতির পানিদাস সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত?

[ঢা. বো-০৪, ০৩, রা. বো-০৫, য. বো-০৫, ০৭]

(ক) কথা (খ) লেখ্য
(গ) সাধু (ঘ) চলিত ✓

৫. নিচের কোনটি মুভারী শব্দ নয়? [রা. বো-১৩]

(ক) চাকু (খ) চিনি
(গ) চুলা (ঘ) চাকর ✓

৬. সাধু ও চলিত ভাষার মূল পার্থক্য কোন পদে বেশি দেখা যায়?

[কু. বো-০৯, রা. বো-০৭, ১১]

(ক) বিশেষ্য ও বিশেষণ (খ) ক্রিয়া ও সর্বনামে ✓
(গ) বিশেষ্য ও ক্রিয়ায় (ঘ) বিশেষণ ও ক্রিয়ায়

৭. কথাবার্তা, বক্তৃতা ও নাটকের সংলাপের জন্যে কোন ভাষা উপযোগী?

[ঢা. বো-০৩, ০৮, ১২, রা. বো-০৬]

(ক) চলিত ✓ (খ) মিশ্র
(গ) মিশ্র (ঘ) উপজাতীয়

৮. কোনটি মিশ্র শব্দ? [য. বো-০১, চ. বো-০৪, ০৬, ০৮, ১২, ব. বো-০৩, চ. বো-০১]

(ক) হাট-বাজার ✓ (খ) চা-চিনি
(গ) নামাজ-রোজা (ঘ) কেতাব-কলম

৯. 'পকেটমার' শব্দটি কোন শ্রেণির? [দি. বো-১১, রা. বো-০৪, কু. বো-০৬]

(ক) তৎসম (খ) দেশি
(গ) বিদেশি (ঘ) মিশ্র ✓

১০. বাংলা ভাষার চলিত রীতির প্রবর্তন করেন কে?

[কু. বো-০৭, সি.বো-০৫, য.বো-০৭,দি.বো-০৯]

(ক) প্যারীচাঁদ মিত্র (খ) গিরিশচন্দ্র সেন
(গ) প্রমথ চৌধুরী ✓ (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১. বাংলা সাহিত্যে চলিত রীতির প্রবর্তক কে?

[দি. বো-০৯, ব. বো-১০, কু. বো-১০, রা. বো-০৮]

(ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(গ) প্যারীচাঁদ মিত্র (ঘ) প্রমথ চৌধুরী ✓

১২. বাংলা ভাষার মূল উৎস কী? [ঢা. বো-০৬, কু. বো-০৭]

(ক) হিন্দি ভাষা (খ) বৈদিক ভাষা ✓
(গ) কানাড়ি ভাষা (ঘ) অন্যান্য ভাষা

১৩. কোন ভাষা হতে বাংলা ভাষার জন্ম হয়? [ঢা.বো-৯৩, কু.বো-০৭, সি.বো-০৩]

(ক) পালি (খ) হিন্দি
(গ) উড়িয়া ✓ (ঘ) বাংলাদেশী

১৪. মনের ভাব প্রকাশের প্রধান বাহন কোনটি? [ঢা.বো-৯৬,য.বো-১২,০৭]

(ক) ভাষা ✓ (খ) চিত্র
(গ) ইঙ্গিত (ঘ) আচরণ

১৫. বাংলাদেশ ছাড়া আর কোন অঞ্চলের মানুষের সর্বজনীন ভাষা বাংলা ভাষা?

[কু.বো-১০, র.বো-০৬]

(ক) আসাম (খ) পশ্চিমবঙ্গ ✓
(গ) গুজরাট (ঘ) উত্তর প্রদেশ

১৬. ভাষা কী? [ঢা.বো-০৫, রা.বো-১২]

(ক) উচ্চারণের প্রতীক (খ) কণ্ঠের উচ্চারণ
(গ) ভাব প্রকাশের মাধ্যম ✓ (ঘ) ধ্বনির সমষ্টি

১৭. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন কোনটি?

[ঢা.বো-০৮, ০৪, ৯২, কু.বো-২০০০, সি.বো-০৯, সকল বো.-৯৮]

(ক) মহাভারত (খ) রামপাল ✓
(গ) রামায়ণ (ঘ) জঙ্গনামা

১৮. মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত বাক সংকেতের সার্থকতার কী বলে?

[রা. বো-০২, য. বো-০৪, কু. বো-০৩, চ. বো-১১, সি. বো-০৯, ০৭, ব. বো-১২, ০৫]

(ক) ধ্বনি
(খ) শব্দ
(গ) বাক্য
(ঘ) ভাষা ✓

১৯. কিসের ভেতর ভাষার পার্থক্য ও পরিবর্তন ঘটে?

[ঢা. বো-১০, চ. বো-০৯, দি. বো-১২, কু. বো-১১]

(ক) দেশ ও কালভেদে
(খ) দেশ, কাল ও বিভিভেদে
(গ) কাল, পরিবেশ ও বিভিভেদে
(ঘ) দেশ, কাল ও পরিবেশভেদে ✓

২০. ভাষাবীদীর জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে বর্তমানে বাংলা ভাষার স্থান কততম?

[রা. বো-১০, য. বো-১০, সি. বো-১২, ০৫, ব. বো-১১, ০৪]

(ক) চতুর্থ ✓
(খ) পঞ্চম
(গ) যষ্ঠ
(ঘ) সপ্তম

২১. বর্তমানে বাংলা কত কোটি লোকের মুখের ভাষা? [য. বো-১১]

(ক) পঁচিশ
(খ) সেভেরো
(গ) ত্রিশ ✓
(ঘ) বাইশ

২২. বাংলা ভাষার রীতি কয়টি? [য. বো-০৩]

(ক) দুইটি ✓
(খ) তিনটি
(গ) চারটি
(ঘ) পাঁচটি

২৩. পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষায় কয়টি রূপ সচল করা যায়? [চ. বো-১০]

(ক) ১টি
(খ) ২টি ✓
(গ) ৩টি
(ঘ) ৪টি

২৪. ভাষার কোন রীতি নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার অনুপযোগী?

[ঢা. বো-০৬, চ. বো-০২, ব. বো-০৯]

(ক) চলিত রীতি
(খ) কথ্য রীতি
(গ) সাধুরীতি ✓
(ঘ) আঞ্চলিক রীতি

২৫. কথা-বার্তা, বক্তৃতা ও নাটকের সংলাপের জন্যে কোন ভাষা উপযোগী?

[ঢা.বো-০৮, ০৩, রা. বো-০৬, য.বো-২০০০]

(ক) চলিত ✓
(খ) সাধু
(গ) মিশ্র
(ঘ) উপজাতীয়

২৬. মধ্যযুগে বাংলা লেখ্য সাধুরীতির সামান্য নমুনা পাওয়া যায়—

[ঢা.বো-০৭, চ.বো-০২]

(ক) কাব্যসাহিত্যে
(খ) দলিল-দস্তাবেজে ✓
(গ) পুঁথিসাহিত্যে
(ঘ) চিঠিপত্রে

২৭. সাধু ও চলিত ভাষা কোন পদে বেশি দেখা যায়?

[রা.বো-১১, ০৭, ০৪, য.বো-২০০০, চ.বো-০৫, ঢা.বো-১০, কু.বো-০৯]

(ক) বিশেষ্য ও বিশেষণ
(খ) ক্রিয়া ও সর্বনাম ✓
(গ) বিশেষ্য ও ক্রিয়া
(ঘ) বিশেষণ ও ক্রিয়া

২৮. নিচের কোন ব্যক্তি চলিত ভাষার ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রেখেছেন?

[রা. বো-০৩, ব.বো-১০]

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(খ) কাজী নজরুল ইসলাম
(গ) প্রমথ চৌধুরী ✓
(ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

২৯. সাধুভাষার বৈশিষ্ট্য কোনটি? [ঢা.বো-০৩, রা. বো-১০, য.বো-০২]

(ক) সহজবোধ্য ✓
(খ) ঘরকথালী
(গ) অবোধ্য
(ঘ) দুর্বোধ্য

৩০. চলিত ভাষারীতির ক্ষেত্রে কোন বৈশিষ্ট্য প্রযোজ্য? [ঢা.বো-০২, চ.বো-০৬]

(ক) ঘরকথালী
(খ) কুটিল
(গ) পরিবর্তনশীল ✓
(ঘ) তৎসম শব্দবহুল

বাংলা ব্যাকরণ

৩১. বাংলা ব্যাকরণ প্রথম রচনা করেন কে? [ঢা.বো. ৯২; কু.বো. ০৭]

(ক) উইলিয়াম কেরী ✓
(খ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
(গ) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
(ঘ) মনোমোহন দাস আসাসুপ্র সাউ

৩২. বাংলা ব্যাকরণ (বাংলা ভাষার) গ্রন্থ প্রথম কোন বাঙালি রচনা করেন?

[ঢা.বো. ৯৪]

(ক) রামরাম বসু
(খ) রামনারায়ণ তর্করত্ন
(গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
(ঘ) রাজা রামমোহন রায় ✓

৩৩. রাজা রামমোহন রায়ের রচিত বাংলা ব্যাকরণের নাম কী?

[ঢা.বো. ৯৪; চ.বো. ৯৬]

(ক) গৌড়ীয় ব্যাকরণ ✓
(খ) মাধবীয় ব্যাকরণ
(গ) মাতৃভাষার ব্যাকরণ
(ঘ) ভাষা ও ব্যাকরণ

৩৪. ব্যাকরণের কাজ কী?

[ঢা.বো. ০৬, ৯৪, ৯৩; রা.বো. ০৭, ৯২; ব.বো. ৯৯; ব.বো. ০৩]

(ক) ভালো বক্তা তৈরি করা
(খ) ভালো অভিনেতা তৈরি করা
(গ) ক্রয় লেখা শেখানো
(ঘ) ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আবিষ্কার করা ✓

৩৫. ব্যাকরণ শব্দের সঠিক/মূলগতিগত অর্থ কী?

[রা.বো. ০৫; কু.বো. ১২; চ.বো. ০৬]

(ক) বিশেষভাবে বিভাজন
(খ) বিশেষভাবে বিশ্লেষণ ✓
(গ) বিশেষভাবে বিভাজন
(ঘ) বিশেষভাবে সংযোজন

৩৬. কী কারণে ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজন? [ঢা.বো. 2000]

(ক) ভাষা বিষয়ে জ্ঞান দানের জন্য
(খ) ভাষা শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয়ের জন্য ✓
(গ) ভাষা শিক্ষার জন্য
(ঘ) ভাষার বিকাশের জন্য

৩৭. বাংলা ব্যাকরণের প্রধান আলোচ্য বিষয় কয়টি?

[ঢা.বো. ০৪; ব.বো. ৯৯; 2000; কু.বো. ০৬; রা.বো. ০৭, ০১; ব.বো. ১০]

(ক) ২টি
(খ) ৩টি ✓
(গ) ৪টি
(ঘ) ৫টি

৩৮. আলোচনার বিষয়বস্তু অনুসারে বাংলা ব্যাকরণকে কয়টি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে?

[সি.বো. ০৯, বে.বো. ০৬]

(ক) ২টি
(খ) ৩টি
(গ) ৪টি ✓
(ঘ) ৫টি

৩৯. প্রত্যেক ভাষারই চারটি মৌলিক অংশ থাকে। অংশগুলো কী কী?

[ঢা.বো. ০৮, 2000, রা.বো. ০৮, ০৩, 2000, যে.বো. ১১, কু.বো. ১১]

(ক) ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, অর্থ ✓
(খ) শব্দ, সন্ধি, সমাস, ধ্বনি
(গ) অনুসর্গ, উপসর্গ, শব্দ, সন্ধি
(ঘ) ধ্বনি, শব্দ, বর্ণ, বাক্য

৪০. প্রত্যেক ভাষার কয়টি মৌলিক অংশ থাকে?

[ঢা.বো. ০৫, যে.বো. ০৯, চ.বো. ১১, কু.বো. ১১, ০৪, সি.বো. ১১, ০৯, রা.বো. ০৫]

(ক) তিনটি
(খ) চারটি ✓
(গ) ছয়টি
(ঘ) দশটি

৪১. সন্ধি বিচ্ছেদের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?

[ঢা.বো. ৯৬; রা.বো. ০৭; যে.বো. ১২, ১০, ০৫; কু.বো. ০৭, ৯৯; চ.বো. ১০, ০৩; সি.বো. ১২, ০৩]

(ক) রূপতত্ত্ব
(খ) ধ্বনিতত্ত্ব ✓
(গ) পদতত্ত্ব
(ঘ) বাক্য প্রকরণ

৪২. পদ ও পদ বিন্যাস বাংলা ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?

[ঢা.বো. ১১, ০১; রা.বো. ১০; কু.বো. ১১, ০৭, ০৫]

(ক) রূপতত্ত্ব
(খ) বাকতত্ত্ব ✓
(গ) ভাষাতত্ত্ব
(ঘ) বাকতত্ত্ব

৪৩. ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় কী কী? [ঢা.বো. ০৫]

(ক) সন্ধি, সমাস, গঠন ও পদ বিধান
(খ) বাক্য গঠন ও উচ্চারণ
(গ) সন্ধি, উপসর্গ ও প্রত্যয়
(ঘ) বচন, বর্ণ ও বর্ণের উচ্চারণাদি ✓

৪৪. বাংলা ব্যাকরণের কোন অংশে বর্ণের বিন্যাস আলোচিত হয়?

[ঢা.বো. ০৩; বে.বো. ০৭]

(ক) বাক্যতত্ত্বে
(খ) ধ্বনিতত্ত্বে ✓
(গ) শব্দতত্ত্বে
(ঘ) রূপতত্ত্বে

৪৫. শব্দের ক্ষুদ্রতম একক কোনটি?

[ঢা.বো. ৯৬; যে.বো. ০৫; বে.বো. ০৭; রা.বো. ০৮]

(ক) শব্দ
(খ) বর্ণ
(গ) ধ্বনি ✓
(ঘ) চিহ্ন

৪৬. বচন, লিঙ্গ, কারক, সমাপিকা ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?

[রা.বো. ০৩; যে.বো. ০৯, ০১; 2000; চ.বো. ০২; সি.বো. ০১; চ.বো. ০৬; বে.বো. ১২; ঢা.বো. ০৮; রা.বে

(ক) ধ্বনিতত্ত্ব
(খ) ভাষাতত্ত্ব
(গ) রূপতত্ত্ব ✓
(ঘ) বাকতত্ত্ব

৪৭. ক্রিয়ার 'কাল' ও 'পুরুষ' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?

[ঢা.বো. ০২; কু.বো. ১২, ০১; 2000; চ.বো. ০১]

(ক) অর্থতত্ত্বের
(খ) রূপতত্ত্বের ✓
(গ) বাকতত্ত্বের
(ঘ) ধ্বনিতত্ত্বের

৪৮. বাক্য ও সমাস ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?

[ঢা.বো. ০৯; রা.বো. ০১; দি.বো. ১১]

(ক) বাকতত্ত্বে
(খ) ধ্বনিতত্ত্বে
(গ) শব্দতত্ত্বে ✓
(ঘ) ভাষাতত্ত্বে

৪৯. খাঁটি বাংলা ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?

[ঢা.বো. ৯৯; যে.বো. ৯৯; সি.বো. ১০]

(ক) ধ্বনিতত্ত্ব
(খ) রূপতত্ত্ব ✓
(গ) বাকতত্ত্ব
(ঘ) ছন্দতত্ত্ব

৫০. পদ প্রকরণ ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?

[ঢা.বো. ১২, ০৫]

(ক) রূপতত্ত্বের ✓
(খ) ধ্বনিতত্ত্বের
(গ) বাকতত্ত্বের
(ঘ) অর্থতত্ত্বের

বাংলা ভাষার রীতি ও বিভাজন

৫১. কোন রীতির উপর ভিত্তি করে লেখ্য ভাষা রীতির রূপ তৈরি হয়?

(ক) সাধু রীতি (খ) আঞ্চলিক রীতি
(গ) কথ্য রীতি ✓ (ঘ) মিশ্র রীতি

৫২. স্কুল ও কলেজের ভাষার যে পরিবর্তন ঘটে তা মূলত কোন ভাষারীতির পরিবর্তন?

(ক) আদর্শ **(খ) প্রমিত ✓**
(গ) কথ্য (ঘ) সাধু

৫৩. কিসের ভেদে ভাষার পার্থক্য ও পরিবর্তন ঘটে?

[ঢা. ১০; চ. ০৯; দি. ১২ অথবা]

(ক) দেশ ও কালভেদে (খ) দেশ, কাল ও ব্যক্তিভেদে
(গ) কাল, পরিবেশ ও ব্যক্তিভেদে **(ঘ) দেশ, কাল ও পরিবেশভেদে ✓**

৫৪. ভাষার আঞ্চলিকতাকে কী নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে? [ব. ২৪]

(ক) আদর্শ কথ্য ভাষা **(খ) উপভাষা ✓**
(গ) লেখ্য ভাষা (ঘ) সাধু ভাষা

৫৫. ভাষার আঞ্চলিক বৈচিত্র্যকে কী বলা হয়? [দি. ২৪]

(ক) প্রাকৃত ভাষা (খ) ভাষ্য ভাষা
(গ) উপভাষা ✓ (ঘ) কৃপদ ভাষা

৫৬. পশ্চিমবঙ্গে কোন উপভাষার ব্যবহার পাওয়া যায়? [দি. ২৪]

(ক) বরেন্দ্রি **(খ) রাঢ়ি ✓**
(গ) কামরূপি (ঘ) পূর্বি

৫৭. পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম অঞ্চল ও আসামের পূর্ব অঞ্চলের উপভাষা কী নামে পরিচিত?

(ক) বাঙালি (খ) কাড়খণ্ডি
(গ) কামরূপি ✓ (ঘ) পূর্বি

৫৮. বিহারের পূর্ব অঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অঞ্চল এবং বাংলাদেশের রংপুর অঞ্চলের উপভাষা কী নামে পরিচিত?

(ক) বরেন্দ্রি ✓ (খ) কামরূপি
(গ) বাঙালি (ঘ) পূর্বি

৫৯. আঞ্চলিক ভাষার অপর নাম- [ঢা. ১৫; ০৩; কু. ১০; ব. ১০]

(ক) কথাভাষা **(খ) উপভাষা ✓**
(গ) সাধুভাষা (ঘ) চলিত ভাষা

৬০. বাঙালি জনগোষ্ঠীর সর্বজনীন কথ্যভাষা কোন রীতির?

(ক) আদর্শ কথ্য রীতি ✓ (খ) আদর্শ লেখ্য রীতি
(গ) প্রমিত রীতি (ঘ) সাধু রীতি

৬১. আদর্শ কথ্যরীতি প্রয়োগের ক্ষেত্র/মাধ্যম হলো-

(ক) আনুষ্ঠানিক বক্তব্য (খ) সংবাদ উপস্থাপন
(গ) আলোচনা ও কবিতা আবৃত্তি **(ঘ) সবগুলোই ✓**

৬২. লিখিত বাংলা ভাষার আদি নিদর্শনের নাম- [য. ১২]

(ক) সাধুরীতি ✓ (খ) আঞ্চলিক কথ্য রীতি
(গ) সাধু এবং চলিত উভয় রীতি (ঘ) চলিত রীতি

৬৩. 'চর্যাপদ' কত বছর আগের সিনিত বাংলা ভাষা?

(ক) প্রায় দুই হাজার **(খ) প্রায় এক হাজার ✓**
(গ) প্রায় নয়শত বছর (ঘ) প্রায় সাতশত বছর

৬৪. 'বাংলা' ভাষায় যে রীতিতে রচিত ভাষা হলো-

(ক) গদ্যরীতি **(খ) কাব্যরীতি ✓**
(গ) নাটকীরীতি (ঘ) প্রমিত রীতি

৬৫. সাধু ও চলিত রীতি বাংলা ভাষার কোন রূপে রয়েছে? [রা. ০৬]

(ক) লেখ্য ✓ (খ) কথ্য
(গ) আঞ্চলিক (ঘ) উপভাষা

৬৬. বাংলা পদ্যরূপ বিকাশ শাখ করে- [ঢা. ০৭; য. ০১]

(ক) প্রাচীন যুগে (খ) মধ্যযুগে
(গ) ইংরেজদের আগমনের পরে **(ঘ) স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে ✓**

৬৭. চলিত রীতিতে একটি আদর্শ রূপ প্রমিত রীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছে কোন শতকে?

[য. ২৪]

(ক) ষোলো শতকে (খ) সতেরো শতকে
(গ) উনিশ শতকে ✓ (ঘ) একুশ শতকে

৬৮. বাংলা কাব্য রীতি কতটি ভাগে বিভক্ত? [য. ২৪]

(ক) দুই ✓ (খ) তিন
(গ) চার (ঘ) পাঁচ

৬৯. বাংলা ভাষার সবচেয়ে পুরনো রীতি হলো-

(ক) অমিত্রাক্ষর **(খ) পয়ার ✓**
(গ) মিত্রাক্ষর (ঘ) পদ কাব্য

৭০. কত শতাব্দী ধরে সাধু রীতি বাংলা লেখা ভাষার চালু রয়েছে?
(ক) প্রায় তিন শতাব্দী
(খ) প্রায় দুই শতাব্দী ✓
(গ) এক শতাব্দী
(ঘ) অর্ধ শতাব্দী

৭১. কোন রীতি তদ্ভব শব্দবহুল? [ব. ০৬; দি. ১৫]
(ক) সাধুরীতি
(খ) আঞ্চলিক কথ্য রীতি
(গ) সাধু এবং চলিত উভয় রীতি
(ঘ) চলিত রীতি ✓

৭২. ভাষার কোন রীতি তৎসম শব্দবহুল? [য. ১২]
(ক) সাধুরীতি ✓
(খ) চলিত রীতি
(গ) কথ্যরীতি
(ঘ) লেখ্যরীতি

৭৩. নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার অনুপযোগী- [ঢা. ০৬; চ. ০২; ব. ০৯]
(ক) চলিত রীতি
(খ) কথ্যরীতি
(গ) সাধুরীতি ✓
(ঘ) আঞ্চলিক রীতি

৭৪. ভাষার কোন রীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের এক বিশেষ গঠন পদ্ধতি মেনে চলে?
[ব. ০৫]
(ক) চলিত রীতি
(খ) সাধুরীতি ✓
(গ) আঞ্চলিক কথ্য রীতি
(ঘ) সাধু ও চলিত উভয় রীতি

৭৫. মধ্যবর্তী বাংলা লেখ্য সাধুরীতির সাধারণ নমুনা পাওয়া যায়- অথবা, মধ্যবর্তী বাংলা গদ্যে সাধুরীতির সাধারণ নমুনার পাওয়া যায়?
[চ. ০২]
(ক) কাব্যসাহিতে
(খ) দলিল-দস্তাবেজে ✓
(গ) পুঁথি সাহিতে
(ঘ) চিঠিপত্রে

৭৬. সাধুরীতির মুল সর্বনামে কী মূল থাকে? [দি. ২৪]
(ক) 'ক'-বর্ণ
(খ) 'ত'-বর্ণ
(গ) 'হ'-বর্ণ ✓
(ঘ) 'মা'-বর্ণ

৭৭. কোন ভাষারীতির গঠনবিধি সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত বা অপরিবর্তনীয়?
[ঢা. ০৯; '০৪; ব ১৯; য. ১২]
(ক) কথ্য রীতি
(খ) লেখ্য রীতি
(গ) সাধুরীতি ✓
(ঘ) চলিত রীতি

৭৮. সাধুভাষার বৈশিষ্ট্য কোনটি? [ঢা. ০৩; রা. ১০; য. ০২]
(ক) গুরুগম্ভীর ✓
(খ) গুরুচণ্ডালী
(গ) অবোধ্য
(ঘ) দুর্বোধ্য

৭৯. কোনটি সাধু ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য? [দি. ১৪]
(ক) তৎসম শব্দবহুল ✓
(খ) তদ্ভব শব্দবহুল
(গ) পরিবর্তনশীল
(ঘ) সহজবোধ্য

৮০. কোনটি সাধুরীতির বৈশিষ্ট্য? [ব. ২০]
(ক) পরিবর্তনশীল
(খ) পদবিন্যাস সুনির্দিষ্ট ✓
(গ) তদ্ভব শব্দবহুল
(ঘ) বক্তৃতার জন্য বেশি উপযোগী

ধ্বনি ও বর্ণ

৮১. কোনটি ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান? [কু. ২৪]
(ক) ধ্বনি ✓
(খ) শব্দ
(গ) বর্ণ
(ঘ) বাক্য

৮২. ভাষার ক্ষুদ্রতম একককে বলে- [চ. ২৩]
(ক) ধ্বনি ✓
(খ) বর্ণ
(গ) শব্দ
(ঘ) বাক্য

৮৩. ভাষার মূল উপাদান কী?
[ঢা. ১৫, ০৯, ০৬; য. ১৩; কু. ১৫, ১৩; চ. ১৭; সি. ২০, ১৪; দি. ১০]
(ক) অক্ষর
(খ) ধ্বনি ✓
(গ) বর্ণ
(ঘ) শব্দ

৮৪. কোনো ভাষার বাকপ্রবাহকে সুজ্ঞাতে বিশ্লেষণ করলে আমরা যেকতকগুলো কী পাই?
[য. ২২]
(ক) বর্ণ
(খ) ধ্বনি ✓
(গ) মৌলিক ধ্বনি
(ঘ) মৌলিক বর্ণ

৮৫. বাংলা ভাষার মৌলিক ধ্বনি কয়টি? [ম. ২৪]
(ক) ৭টি
(খ) ৩২টি
(গ) ৩৩টি ✓
(ঘ) ৫০টি

৮৬. নিচের কোনটি মৌলিক স্বরধ্বনি? [সি. ২৪]
(ক) আ ✓
(খ) ঐ
(গ) ও
(ঘ) ঔ

৮৭. কোন মৌলিক স্বরধ্বনিটির কোন লিখিত রূপ নেই? [দি. ১১]
(ক) আ
(খ) অ
(গ) ই
(ঘ) এ্যা ✓

৮৮. বাকপ্রত্যঙ্গজাত ধ্বনির সৃষ্টতম মৌলিক অংশ বা এককে বলা হয়- [ম. ২০]

(ক) ধ্বনিমূল ✓ (খ) প্রতিপাদিক
(গ) প্রত্যয় (ঘ) নাম প্রকৃতি

৮৯. মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি? [ঢা. ২৩]

(ক) ২৬ (খ) ৩০ ✓
(গ) ৩২ (ঘ) ৩৯

৯০. কোন ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস তাড়িত বাতাস মুখবিবরের কোথাও না কোথাও বাধা পায়? [য. ৯৩; ব. ০৮]

(ক) স্বরধ্বনি (খ) বাজনাধ্বনি
(গ) কণ্ঠধ্বনি ✓ (ঘ) ইংরেজি ধ্বনি

৯১. ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে কী বলে? [ঢা. ১৬; য. ১০; সি. ০৯, ০৬; ব. ০৭]

(ক) অক্ষর (খ) বর্ণ ✓
(গ) বর্ণমালা (ঘ) চিহ্ন

৯২. বাংলা ভাষার অসংযুক্ত বর্ণের সংখ্যা? [চ. ২২]

(ক) ১১টি (খ) ২৫টি
(গ) ৪০টি (ঘ) ৫০টি ✓

৯৩. বাংলা বর্ণমালার মূল বর্ণ কয়টি?

(ক) ৫০ ✓ (খ) ৩৯
(গ) ২৫ (ঘ) ১১

৯৪. বাংলা ভাষার স্বরধ্বনির সংখ্যা কয়টি? [য. ২০০০]

(ক) ১০টি ✓ (খ) ১২টি
(গ) ১৩টি (ঘ) ১১টি

৯৫. বাংলা ভাষার মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা কয়টি? [ম. বো. ২২]

(ক) বিশ (খ) বাইশ
(গ) পঁচিশ (ঘ) একিশ ✓

৯৬. আ,আই, অর্থমিলা এবং পূর্ণমাত্রা বর্ণের সংখ্যা যথাক্রমে- [চ. ২০]

(ক) ৮, ১০, ৩২ (খ) ৮, ১২, ৩০
(গ) ১০, ৮, ৩২ (ঘ) ১২, ৮, ৩০ ✓

৯৭. বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা কয়টি? [ম. বো. ২২]

(ক) পাঁচ (খ) ছয়
(গ) সাত ✓ (ঘ) আট

৯৮. স্বরবর্ণের পূর্ণ রূপ কয়টি? [দি. ১৭]

(ক) সাতটি (খ) নয়টি
(গ) দশটি (ঘ) এগারোটি ✓

৯৯. বাংলা ভাষায় কোন স্বরধ্বনির সংক্ষিপ্ত রূপ নেই? [সি. ২৪]

(ক) এ (খ) ঐ
(গ) অ ✓ (ঘ) ঈ

১০০. স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ কয়টি? [দি. ১৩]

(ক) আটটি (খ) নয়টি
(গ) দশটি ✓ (ঘ) এগারোটি

১০১. স্বরবর্ণ সংক্ষিপ্তাকারে ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত হলে তাকে বলে- [য. ৯৯; কু. ৯৩]

(ক) ফলা (খ) কার ✓
(গ) রেখা (ঘ) যুক্তবর্ণ

১০২. কোন মৌলিক স্বরধ্বনিটির কোন লিখিত রূপ নেই? [দি. ১১]

(ক) আ (খ) অ
(গ) ই (ঘ) এ্যা ✓

১০৩. স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয়- [ঢা. ০৮; রা. ২০০০; সি. ০১]

(ক) আ-কার (খ) ই-কার
(গ) কার ✓ (ঘ) কার

১০৪. স্বরবর্ণের পূর্ণ রূপ লেখা হয় কখন? [চ. ০৭]

(ক) স্বরধ্বনি ব্যঞ্জনধ্বনির সাথে যুক্ত হয় (খ) স্বরবর্ণ যখন স্বাধীন বা নিরপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয় ✓
(গ) ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে ব্যবহৃত হলে (ঘ) ব্যঞ্জনবর্ণের পরে ব্যবহৃত হলে

১০৫. কোনো স্বরবর্ণ কোন আকারে ব্যঞ্জনধ্বনির সাথে যুক্ত হয়ে উচ্চারিত হয়? [ঢা. ৯৪; কু. ৯৪]

(ক) প্রসারিত আকারে (খ) সংক্ষিপ্ত আকারে ✓
(গ) রেফ (ঘ) ম-ফলা

১০৬. বাংলা বর্ণমালার ফলা কয়টি? [কু. ০৭; ব. ০৫; দি. ২২]

(ক) ছয়টি ✓ (খ) আটটি
(গ) দশটি (ঘ) এগারোটি

১০৭. ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলা হয়?

[ঢা. ০৬; রা. ০৫, ৯৩; য. ৯৮; কু. ০৮, ৯৪, ৯২; সি. ১১, ০২; ব. ১০, ০২; দি. ১৪]

(ক) কার
(খ) ফলা ✓
(গ) মাত্রা
(ঘ) কষি

১০৮. 'র' এর একটি অনুরূপ ফলা-

(ক) র-ফলা
(খ) য-ফলা
(গ) অর্ধসংক্ষিপ্ত আকারে ✓
(ঘ) ম-ফলা

১০৯. সংযুক্ত বর্ণের কোন রূপটি সঠিক? [কু. ০৮; য. ২০০০]

(ক) ক্ + গ = অক্
(খ) হ্ + ণ = ক্ষ
(গ) ক্ + ষ = ক্ষ ✓
(ঘ) হ্ + ম = ক্ষ

১১০. 'ক্ষ' যুক্ত বর্ণটির বিচ্ছিন্ন রূপ কী? [কু. ০৫]

(ক) ক্ + ষ ✓
(খ) হ্ + ম
(গ) হ্ + ণ
(ঘ) হ্ + ণ

বর্ণজনি

১১১. জিভের উচ্চতা অনুযায়ী বর্ণধ্বনিকে কত ভাগে ভাগ করা হয়েছে?

(ক) ৩
(খ) ৪ ✓
(গ) ৫
(ঘ) ৬

১১২. ঠোঁটের উদ্ভৃতি অনুসারে বর্ণধ্বনিকে কত শ্রেণিতে ভাগ করা যায়?

[রা. ২৩; দি. ২৩]

(ক) ৬
(খ) ৫
(গ) ৪ ✓
(ঘ) ৩

১১৩. নিরাবষ্টিত মধ্য বর্ণধ্বনি কোনটি?

(ক) অ ✓
(খ) আ
(গ) ই
(ঘ) উ

১১৪. বিবৃত বর্ণধ্বনি কোনটি? [রা. ২৪]

(ক) এ
(খ) ও
(গ) অ
(ঘ) আ ✓

১১৫. জিভের সমুখ-পশ্চাৎ অবস্থান অনুযায়ী অনুনাসিক বর্ণধ্বনিগুলো কয় ভাগে বিভক্ত?

[রা. ২৪]

(ক) দুই ভাগে
(খ) তিন ভাগে ✓
(গ) চার ভাগে
(ঘ) পাঁচ ভাগে

১১৬. জিভের সমুখ-পশ্চাৎ অবস্থান অনুযায়ী সমুখ বর্ণধ্বনি কোনগুলো?

[রা. ২৩]

(ক) এ, ও
(খ) অ, ও
(গ) আ, অ
(ঘ) ঈ, এ, এ ✓

১১৭. উচ্চ সমুখ বর্ণধ্বনির উদাহরণ- [ক. ১৪]

(ক) ই, এ ✓
(খ) উ, ও
(গ) ই, ঈ
(ঘ) উ, উ

১১৮. উচ্চারণের দিক থেকে নিরাবষ্টিত পশ্চাৎ বর্ণধ্বনি নিচের কোনটি?

[বি. ১৫]

(ক) ও
(খ) উ
(গ) এ
(ঘ) অ ✓

১১৯. উচ্চ-মধ্য পশ্চাৎ বর্ণধ্বনি কোনটি?

(ক) ই
(খ) ঈ
(গ) ও ✓
(ঘ) এ

১২০. কোন কোন ঘনি উচ্চারণের সময় জিহ্বা পিছিয়ে আসে?

(ক) ই, উ
(খ) ই, ঙ
(গ) ই, উ
(ঘ) উ, উ ✓

১২১. 'আ' ধ্বনি উচ্চারণের সময় ঠোঁটের উদ্ভৃতি কেমন? [কু. ২৪]

(ক) বিবৃত ✓
(খ) অর্ধ-বিবৃত
(গ) অর্ধ-সংবৃত
(ঘ) সংবৃত

১২২. 'এ' ধ্বনির উচ্চারণ হয়-

(ক) সংবৃত ও বিবৃত
(খ) বিবৃত
(গ) সংবৃত ✓
(ঘ) অর্ধ সংবৃত

১২৩. মৌলিক বর্ণধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময় বায়ু- কোথা থেকে বেরিয়ে আসে?

[য. ২৪]

(ক) শুধু মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। ✓
(খ) শুধু নাক দিয়ে বেরিয়ে আসে।
(গ) নাক ও মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে।
(ঘ) আল জিভায় বাধা পেয়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে।

১২৪. কোন বর্ণধ্বনি উচ্চারণের সময় বায়ু শুধু মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে?

(ক) মৌখিক
(খ) দ্বিস্বর
(গ) মৌলিক ✓
(ঘ) বিবৃত

১২৫. কোনটি মৌলিক বর্ণধ্বনি? [ঢা. ২৪; চ. ১৯]

(ক) ই
(খ) ঈ ✓
(গ) এ
(ঘ) সবকটি

১২৬. অনুনাসিক বর্ণধ্বনি উচ্চারণে কোনটি নিচে নেমে আসে? [দি. ২৪]

(ক) ওষ্ঠ
(খ) আলজিভ
(গ) মূর্ধা
(ঘ) কোমল তালু ✓

১২৭. বাংলা ভাষায় অর্ধবর্ণধ্বনি কতটি? [চি. ২৩; ব. ২৪]

(ক) দুইটি
(খ) তিনটি
(গ) চারটি ✓
(ঘ) পাঁচটি

১২৮. অর্ধবর্ণধ্বনির উদাহরণ কোনটি? [দি. ২৩]

(ক) এ
(খ) ই
(গ) আ
(ঘ) ঈ ✓

১২৯. নিচের কোন বর্ণটি অর্ধবর্ণধ্বনির উদাহরণ?

(ক) উ ✓
(খ) ঊ
(গ) আ
(ঘ) এ

১৩০. 'চাই' শব্দের পূর্ণ বর্ণধ্বনি কোনটি? [দি. ২৪]

(ক) [ই]
(খ) [আ] ✓
(গ) [চ]
(ঘ) [গ]

১৩১. নিচের কোন শব্দটিতে অর্ধবর্ণধ্বনি রয়েছে? [দি. ২৪]

(ক) চাই ✓
(খ) যাও
(গ) বউ
(ঘ) সেই

১৩২. 'চাই' শব্দের মধ্যে কোন বর্ণধ্বনি আছে? [কু. ২৩]

(ক) আ + ই ✓
(খ) আ + এ
(গ) অ + ই
(ঘ) অ + এ

১৩৩. 'পাউ' - এখানে পূর্ণ বর্ণধ্বনি কোনটি? [দি. ২৩]

(ক) উ
(খ) আ ✓
(গ) ও
(ঘ) এ

১৩৪. 'মৌ, বউ' শব্দের উচ্চারণের মধ্যে কোন কোন বর্ণধ্বনি রয়েছে?

[রা. ২৩]

(ক) আ + ই
(খ) আ + উ
(গ) ও + উ ✓
(ঘ) অ + ই

১৩৫. নিচের কোনটি দ্বিবর্ণধ্বনির উদাহরণ? [দি. ১৬]

(ক) শাপলা
(খ) মৌ/বউ ✓
(গ) শেফালি
(ঘ) গোলাপ

ব্যঞ্জনধ্বনি

১৩৬. উচ্চারণস্থান ও প্রকৃতি এবং ধ্বনির কম্পনপ্রবাহ ও বায়ুপ্রবাহ অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনি কত ধরনের?

(ক) ৬
(খ) ৫
(গ) ৪ ✓
(ঘ) ৩

১৩৭. উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিকে কতটি ভাগে ভাগ করা যায়?

(ক) ৪
(খ) ৫ ✓
(গ) ৬
(ঘ) ৭

১৩৮. ওষ্ঠ ব্যঞ্জনধ্বনি আর কী নামে পরিচিত?

(ক) স্পর্শধ্বনি
(খ) স্পর্শ বজ্জন
(গ) দ্বি-ওষ্ঠ ✓
(ঘ) কণ্ঠ বজ্জন

১৩৯. কোনগুলো ওষ্ঠ্যধ্বনি? [ঢাকা বোর্ড ০০]

(ক) চ ছ জ ঝ ঞ
(খ) ট ঠ ড ঢ ণ
(গ) ত থ দ ধ ন
(ঘ) প ফ ব ভ ম ✓

১৪০. 'ণ' বর্ণের ধ্বনিতাত্ত্বের উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী নাম- [য.বো ০৮]

(ক) কণ্ঠ্যধ্বনি
(খ) তালব্যধ্বনি
(গ) মূর্ধন্যধ্বনি ✓
(ঘ) ওষ্ঠ্যধ্বনি

১৪১. দন্তমূলীয় ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ কোনটি? [যশোর বোর্ড ২৪]

(ক) র-ধ্বনি ✓
(খ) ল-ধ্বনি
(গ) ঝ-ধ্বনি
(ঘ) খ-ধ্বনি

১৪২. দন্তমূলীয় ধ্বনি কোনটি? [সিলেট বোর্ড ২০]

(ক) ন ✓
(খ) দ
(গ) ব
(ঘ) জ

১৪৩. উচ্চারণস্থান অনুসারে 'ট' বর্ণের ধ্বনিসমূহের নাম কী?

[কুমিল্লা বোর্ড ০৫]

(ক) কণ্ঠ্যধ্বনি
(খ) তালব্য ধ্বনি
(গ) মূর্ধন্য ধ্বনি ✓
(ঘ) দন্ত্য ধ্বনি

১৪৪. তালব্য ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণে আছে কোন শব্দে? [সি.বো ২৪]

(ক) কাকা
(খ) খড়
(গ) চাচা ✓
(ঘ) ধান

১৪৫. কোনগুলো কণ্ঠ্যধ্বনি?

[রাজশাহী বোর্ড ১১, ০৬, ০৩, ৯২; যশোর বোর্ড ৩০; কুমিল্লা বোর্ড ৯৩; চট্টগ্রাম বোর্ড ০১; সিলেট বোর্ড ০৪]

(ক) ক খ গ ঘ ঙ ✓
(খ) ট ঠ ড ঢ ণ
(গ) চ ছ জ ঝ ঞ
(ঘ) ত থ দ ধ ন

১৪৬. উ-বর্গীয় ধ্বনি নয় কোনটি? [সিলেট বোর্ড ২২]

(ক) ট
(খ) ঠ
(গ) ণ
(ঘ) ন ✓

১৪৭. 'অ'-এর উচ্চারণস্থান কোনটি? [রাজশাহী বোর্ড ১৪]

(ক) কণ্ঠ
(খ) তালু ✓
(গ) ওষ্ঠ
(ঘ) দন্ত

১৪৮. 'অ' ধ্বনির উচ্চারণস্থান কোনটি? [ঢাকা বোর্ড ১৩]

(ক) ওষ্ঠ
(খ) কণ্ঠ
(গ) ঘ ✓
(ঘ) দন্ত

১৪৯. উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির বর্ণসমূহে তালব্য বর্ণ?

[রাজশাহী বোর্ড ২৩]

(ক) প ফ ব ভ ম
(খ) ক খ গ ঘ ঙ
(গ) চ ছ জ ঝ শ ✓
(ঘ) ট ঠ ড ঢ ণ প র ড ঢ

১৫০. কতনালীয় ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ আছে কোন শব্দে?

(ক) ক
(খ) ল
(গ) র ✓
(ঘ) হ

১৫১. কোনগুলো নাসিক্য ধ্বনির উদাহরণ অথবা, কোনগুলো অনুনাসিক বর্ণ?

(ক) ঙ, ঞ, ন, স
(খ) ঙ, ন, ম ✓
(গ) উ, ন, ম, ং
(ঘ) এ, ঞ, চ, ড়, ণ, য

১৫২. কোন দুটি নাসিক্য ধ্বনি? [সিলেট বোর্ড ২২]

(ক) ক, খ
(খ) ড, থ
(গ) ণ, ম ✓
(ঘ) ন, ধ

১৫৩. কোনটি নাসিক্য ধ্বনি? [ঢাকা বোর্ড ১৪]

(ক) জ
(খ) গ
(গ) ম ✓
(ঘ) ঘ

১৫৪. কোনব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে দুটি বাক্যতন্ত্র কাছাকাছি এসে নিঃসৃত বায়ুতে ঘর্ষণ সৃষ্টি করে সেগুলোকে বলে-

[বরিশাল বোর্ড ২২]

(ক) নাসিক্য বজ্জন
(খ) উষ্ম বজ্জন ✓
(গ) পার্শ্বিক বজ্জন
(ঘ) কম্পিত বজ্জন

১৫৫. উষ্মবর্ণ কোনটি? [কুমিল্লা বোর্ড ৯৯]

(ক) জ
(খ) শ ✓
(গ) এ
(ঘ) চ

১৫৬. শ, ষ, স, হ- এ চারটি বর্ণের নাম-

[ঢাকা বোর্ড ০৬; যশোর বোর্ড ০৭; বরিশাল বোর্ড ১৩, ০৭; দিনাজপুর বোর্ড ১৩, ১১]

(ক) উষ্ম বর্ণ ✓
(খ) স্পর্শ বর্ণ
(গ) অন্তঃস্থ বর্ণ
(ঘ) নাসিক্য বর্ণ

১৫৭. উচ্চারণস্থান অনুসারে উষ্ম বজ্জন ধ্বনিগুলোকে কী কী ভাগে ভাগ করা যায়?

[বরিশাল বোর্ড ২৩]

(ক) দন্তমূলীয়, তালব্যনীয়
(খ) দন্তমূলীয়, কণ্ঠনালীয়, পার্শ্বিক ✓
(গ) তালব্য, কণ্ঠনালীয়, নাসিক্য
(ঘ) কণ্ঠনালীয়, দন্তমূলীয়, মৃদুধ্বনি

১৫৮. কোন বিরতি মূলক উষ্মবর্ণ বলা হয়? অথবা, কোনগুলো উষ্মধ্বনি?

[যশোর বোর্ড ০২; কুমিল্লা বোর্ড ০১, ৯৬; চট্টগ্রাম বোর্ড ৯৬; সিলেট বোর্ড ১০]

(ক) ক, ছ, ট, ত
(খ) শ, ছ, ই, থ
(গ) শ, স, হ ✓
(ঘ) ণ, ঘ, ন, চ

১৫৯. কোন ধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময় জিহ্বার দু'পাশ দিয়ে বাতাস বেরিয়ে যায়?

[কুমিল্লা বোর্ড ১৬]

(ক) ন
(খ) ম
(গ) স
(ঘ) ল ✓

১৬০. নিচের কোনটি পার্শ্বিক ধ্বনি?

(ক) র
(খ) ল ✓
(গ) শ
(ঘ) হ

১৬১. নিচের কোন শব্দে কম্পিত ব্যঞ্জনধ্বনি রয়েছে? [বরিশাল বোর্ড ২৪]

(ক) ভার
(খ) লাল
(গ) বাড়ি ✓
(ঘ) শসা

১৬২. কোনটি কম্পনজাত ধ্বনি?

[ঢাকা বোর্ড ১৩; চট্টগ্রাম বোর্ড ১৩; দিনাজপুর বোর্ড ১৬]

(ক) ল
(খ) ড়
(গ) র ✓
(ঘ) ঢ়

১৬৩. তাড়নজাত ধ্বনি কোনটি? [চট্টগ্রাম বোর্ড ০৪; বরিশাল বোর্ড ০৪]

(ক) ঢ
(খ) ল
(গ) র
(ঘ) ড় ✓

১৬৪. 'ঢ' ও 'ব' ধ্বনি দুটিকে কী ধ্বনি বলে?

[ঢাকা বোর্ড ০৭; চট্টগ্রাম বোর্ড ২০; বরিশাল বোর্ড ১২, ০১; সিলেট বোর্ড ৯৮]

(ক) ঘোষধ্বনি
(খ) নিসঃধ্বনি
(গ) কম্পনজাত ধ্বনি
(ঘ) তাড়নজাত ধ্বনি ✓

১৬৫. ল, র, ড়- ধ্বনিকে বলে-

(ক) অঘোষ
(খ) ঘোষ ✓
(গ) তাড়িত
(ঘ) মহাপ্রাণ

বাগযন্ত্র

১৬৬. ভাষা কিসের দ্বারা সৃষ্ট হয়? [কু. ০৮]

(ক) মনের সাহায়ে
(খ) অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাহায়ে
(গ) ঠোঁটের সাহায়ে
(ঘ) বাগযন্ত্রের সাহায়ে ✓

১৬৭. অর্থাৎ, মানুষের ভাষা কিসের সাহায়তে সৃষ্টি হয়? [কু. ০৮]

(ক) মনের সাহায়ে
(খ) অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাহায়ে
(গ) ঠোঁটের সাহায়ে
(ঘ) বাগযন্ত্রের সাহায়ে ✓

১৬৮. কোনটি বাগযন্ত্র? [কু. ২৩]

(ক) নাক ✓
(খ) কান
(গ) গলা
(ঘ) মাথা

১৬৯. ধ্বনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুখবিবরের উচ্চারণের মূল উপকরণ বা উৎকারক হলো-

[কু. ১২, ১১, ০৪; স. ১৬]

(ক) ফুসফুস ও ওষ্ঠ
(খ) দাঁতের পাটি ও আলিজভ
(গ) জিহ্বা ও ওষ্ঠ ✓
(ঘ) নরম তালু ও জিহ্বা

১৭০. কোনটি স্পর্শ কণ্ঠধ্বনি উচ্চারিত হয়? [চ. ২৪]

(ক) তালু ও জিভ
(খ) জিভ ও দন্ত
(গ) কোমল তালু ও আলিজভ ✓
(ঘ) ঠোঁট ও জিভ

১৭১. তালুর ভাগ কয়টি? [চি. ২৪]

(ক) দুইটি ✓
(খ) তিনটি
(গ) চারটি
(ঘ) পাঁচটি

১৭২. ধ্বনি সৃষ্টিকারী বায়ুপ্রবাহের উৎস কোনটি? [য. ২৩]

(ক) মুখবিবর
(খ) দাঁত ✓
(গ) নাসানালি
(ঘ) স্বরযন্ত্র

১৭৩. ধ্বনি কিসের দ্বারা সৃষ্টি হয়?

(ক) ফুসফুস
(খ) জিহ্বা
(গ) বাগযন্ত্র ✓
(ঘ) কণ্ঠনালি

১৭৪. ধ্বনি উচ্চারণের উৎস হলো- [য. ০৬]

(ক) কণ্ঠ
(খ) নাসানালী
(গ) সরতন্ত্রী
(ঘ) ফুসফুস ✓

১৭৫. ফুসফুস থেকে বাতাস কী দিয়ে বের হয়ে আসে?

(ক) বাদানালি
(খ) নিচের চোয়াল
(গ) উপরের চোয়াল
(ঘ) নাসারন্ধ্র ✓

১৭৬. শরীরের কোন অঙ্গটিকে ধ্বনির বৈচিত্র্য তৈরির মূল বলা হয়?

[সি. ০৫]

(ক) ঠোঁট
(খ) ফুসফুস
(গ) দাঁত
(ঘ) জিহ্বা ✓

১৭৭. মুখগহ্বরের কোমল তালুর পিছনে ঝুলন্ত মাংসপিন্ডের নাম কী?

(ক) স্বরতন্ত্র
(খ) আলিজিভ ✓
(গ) অবিজিহ্বা
(ঘ) গলবিলীয় গহ্বর

১৭৮. শক্ত তালু ও উপরের পাটির দাঁতের মধ্যবর্তী উঁচু অংশকে কী বলে?

(ক) আলিজিভ
(খ) অবিজিহ্বা
(গ) স্বরতন্ত্র
(ঘ) মূর্ধা ✓

১৭৯. ওষ্ঠের মধ্যকার ফাঁকের কম-বেশির ভিত্তিতে বর্ণনিকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?

(ক) দুই ✓
(খ) তিন
(গ) চার
(ঘ) পাঁচ

১৮০. কজনধ্বনি উচ্চারণ করতে বাগযন্ত্রের কোন অংশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে?

(ক) জিহ্বা
(খ) দাঁত
(গ) ওষ্ঠ ✓
(ঘ) তালু

১৮১. ধ্বনি উৎপাদনের ক্ষেত্র ও উচ্চারণের মূল উপকরণ- [রা. ৯৩; য. ১৩]
(ক) মুখবিবর ও জিহ্বা
(খ) কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও জিহ্বা
(গ) দাঁত ও ওষ্ঠ
(ঘ) মুখবিবর, জিহ্বা ও ওষ্ঠ ✓

১৮২. বাগযন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে সরল ও সক্রিয় প্রত্যঙ্গ কোনটি? [রা. ২৪]
(ক) ওষ্ঠ
(খ) মূর্ধা
(গ) জিভ ✓
(ঘ) তালু

১৮৩. কোনটি বাগযন্ত্রের সবচেয়ে সরল ও সক্রিয় প্রত্যঙ্গ? [কু. ২৪]
(ক) দন্তমূল
(খ) ফুসফুস
(গ) নাসানলি
(ঘ) জিভ ✓

১৮৪. বাংলা ভাষার মৌলিক ধ্বনি কয়টি?
(ক) ৩৭টি ✓
(খ) ৩৩টি
(গ) ২৬টি
(ঘ) ১১টি

১৮৫. ৩৭টি মৌলিক ধ্বনিকে প্রকাশ করার জন্য মূল বর্ণ রয়েছে-
(ক) ৩৭টি
(খ) ৩২টি
(গ) ৩৩টি
(ঘ) ৫০টি ✓

১৮৬. 'ণ' বর্ণের উচ্চারণ কত রকম?
(ক) ৮
(খ) ৪
(গ) ৩
(ঘ) ২ ✓

১৮৭. 'অতি' শব্দের সঠিক উচ্চারণ কোনটি? [দিনাজপুর বোর্ড ২৩]
(ক) উতি
(খ) অহতি
(গ) ওতি ✓
(ঘ) ওতি

১৮৮. 'আ' এর স্বাভাবিক উচ্চারণ নেই কোনটিতে? [চ বো ২৪]
(ক) জাপান ✓
(খ) আকাশ
(গ) রাত
(ঘ) আলো

১৮৯. 'ই' ধ্বনির হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা বোঝাতে যে দুটি বর্ণ রয়েছে-
(ক) ই, ঈ ✓
(খ) উ, ঊ
(গ) এ, ও
(ঘ) আ, আ

১৯০. 'ই' ধ্বনির হ্রস্বতা বোঝাতে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটি-
(ক) দিন ✓
(খ) দীন
(গ) বীণা
(ঘ) ইন

১৯১. 'এ' বর্ণের উচ্চারণ কয় রকমের? [ময়মনসিংহ বোর্ড ২৪]
(ক) দুই
(খ) তিন ✓
(গ) চার
(ঘ) পাঁচ

১৯২. নিচের কোনটি 'এ' বর্ণের স্বাভাবিক উচ্চারণ?
(ক) বেলা
(খ) বিশু
(গ) একটা
(ঘ) এলো ✓

১৯৩. কোন শব্দটিতে 'এ' বর্ণের 'অ্যা' উচ্চারণ ঘটেছে? [বি বো ২৩]
(ক) একটি
(খ) দেশ
(গ) এলো
(ঘ) একটা ✓

১৯৪. 'তেল'-এর সঠিক উচ্চারণ-
(ক) তইল
(খ) তেইল
(গ) তোইলো ✓
(ঘ) তেলো

১৯৫. 'ঔষধ' শব্দের সঠিক উচ্চারণ কোনটি? [সিলেট বোর্ড ২৩]
(ক) ঔষাধ
(খ) ওউষধ ✓
(গ) ওশোধ
(ঘ) ঔসাধ

১৯৬. 'ঔ' বর্ণের উচ্চারণ কিসের মতো?
(ক) ও
(খ) ওউ ✓
(গ) ঔ
(ঘ) ওল

১৯৭. 'সৌমাছি'-এর সঠিক উচ্চারণ হলো- [ঢাকা বোর্ড ২৪]
(ক) লৌআমিছি
(খ) মাউমাছি
(গ) মৌমাছি
(ঘ) মৌউমাছি ✓

১৯৮. 'ঁ' বর্ণের স্বতন্ত্র ব্যবহারে উচ্চারিত হয়-
(ক) অ ✓
(খ) ই
(গ) ঈ
(ঘ) আ

১৯৯. 'ঋ' বর্ণ সংযুক্ত ব্যঞ্জনে কিসের মতো উচ্চারিত হয়?
(ক) ম
(খ) থ
(গ) র ✓
(ঘ) ঙ

২০০. শব্দের মধ্যে বা শেষে ব-ফলা যুক্ত হলে উচ্চারণ হয়-
[রাজশাহী বোর্ড ২৩]
(ক) বিত্ত ✓
(খ) অঘোষ
(গ) ঘোষ
(ঘ) মহাপ্রাণ

২০১. কোন শব্দটিতে ব-ফলার উচ্চারণ হবে না? [যশোর বোর্ড ২৩]
(ক) নিষদ
(খ) বন্ধ
(গ) আস্বাদন
(ঘ) স্বাধীন ✓

২০২. 'পশা' শব্দের সঠিক উচ্চারণ কোনটি? [কুমিল্লা বোর্ড ২৪]

(ক) পদ | (খ) পদো ✓
(গ) পোদদো | (ঘ) পোদদ

২০৩. 'শৃগাল' শব্দের সঠিক উচ্চারণ রূপ কোনটি? [বি বো ২৪]

(ক) শিয়াল | (খ) শৃগাল
(গ) শিগাল ✓ | (ঘ) শুগাল

২০৪. 'স্মরণ' শব্দের সঠিক উচ্চারণ কোনটি? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২৩]

(ক) শোরানো | (খ) শোনারন ✓
(গ) সৌরন | (ঘ) সৌরান

২০৫. 'সাধারণ' শব্দের উচ্চারণ কোনটি? [ময়মনসিংহ বোর্ড ২৩]

(ক) সাধারোন | (খ) শাধারন
(গ) শাধারন | (ঘ) শাধারোন ✓

শব্দ ও পদের গঠন

২০৬. 'পরিচালক' শব্দের 'পরি' অংশটি কী?

(ক) ধাতু | (খ) প্রত্যয়
(গ) উপসর্গ ✓ | (ঘ) লগ্নক

২০৭. 'সাংবাদিক' শব্দের 'ইক' অংশটি কী?

(ক) উপসর্গ | (খ) বিভক্তি
(গ) প্রত্যয় ✓ | (ঘ) শব্দমূল

২০৮. 'মা', 'গাছ', 'লতা' — এগুলো কী ধরনের শব্দ?

(ক) ধাতু | (খ) সাধিত শব্দ
(গ) নামপ্রকৃতি ✓ | (ঘ) উপসর্গ

২০৯. 'কর', 'বল', 'চল' এগুলো কী?

(ক) উপসর্গ | (খ) ধাতু ✓
(গ) বিভক্তি | (ঘ) প্রত্যয়

২১০. একাধিক শব্দ একত্রে মিলে এক নতুন শব্দ পঠনের প্রক্রিয়াকে কী বলে?

(ক) প্রত্যয় | (খ) শব্দদ্বিত্ব
(গ) সমাস ✓ | (ঘ) কারক

২১১. 'হাটবাজার' কোন প্রক্রিয়ার গঠিত?

(ক) উপসর্গ | (খ) প্রত্যয়
(গ) শব্দদ্বিত্ব | (ঘ) সমাস ✓

২১২. 'ঠকঠক' কোন প্রক্রিয়ার গঠিত শব্দ?

(ক) শব্দদ্বিত্ব ✓ | (খ) সমাস
(গ) উপসর্গ | (ঘ) ধাতু

২১৩. বাক্যে ব্যবহৃত শব্দকে কী বলে?

(ক) ধাতু | (খ) পদ ✓
(গ) প্রকৃতি | (ঘ) লগ্নক

২১৪. পদে পরিণত হওয়ার সময় শব্দের সঙ্গে যে অংশ যুক্ত হয় তাকে কী বলে?

(ক) ধাতু | (খ) উপসর্গ
(গ) লগ্নক ✓ | (ঘ) প্রত্যয়

২১৫. 'করলাম' এর 'লাম' অংশটি কী নির্দেশ করে?

(ক) ধাতু-বিভক্তি | (খ) কারক-বিভক্তি
(গ) প্রত্যয় | (ঘ) ক্রিয়া-বিভক্তি ✓

২১৬. কোনটি লগ্নক নয়?

(ক) বিভক্তি | (খ) নির্দেশক
(গ) শব্দমূল ✓ | (ঘ) বলক

২১৭. 'ছেলেরা ক্রিকেট খেলে' বাক্যে 'ক্রিকেট' পদটি কী?

(ক) ধাতু | (খ) অনুসর্গ পদ ✓
(গ) সলাপ পদ | (ঘ) শব্দদ্বিত্ব

২১৮. পদ কয় প্রকার?

(ক) ২ ✓ | (খ) ৩
(গ) ৪ | (ঘ) ৫

২১৯. কোনটি সাধিত শব্দ?

(ক) মা | (খ) গাছ
(গ) সাংবাদিক ✓ | (ঘ) চল

২২০. শব্দ গঠনের প্রধান দুই অংশ কী কী?

(ক) ধাতু ও বিভক্তি | (খ) উপসর্গ ও বলক
(গ) শব্দমূল ও লগ্নক | (ঘ) উপসর্গ ও প্রত্যয় ✓

২২১. শব্দ যখন বাক্যে স্থান পায়, তখন তা কী নামে পরিচিত?

(ক) ধাতু | (খ) শব্দমূল
(গ) পদ ✓ | (ঘ) উপসর্গ

২২২. কোনটি শব্দ গঠনের অংশ নয়?

(ক) সমাস (খ) শব্দদ্বিত্ব

(গ) বিভক্তি ✓ (ঘ) উপসর্গ

২২৩. 'অছাঁট' শব্দটি কিভাবে গঠিত?

(ক) সমাস (খ) শব্দদ্বিত্ব ✓

(গ) ধাতু (ঘ) প্রত্যয়

২২৪. 'পরিচালক' শব্দটি কোন পদ্ধতি/প্রক্রিয়ায় তৈরি?

(ক) উপসর্গ + নামপ্রকৃতি ✓ (খ) ধাতু + প্রত্যয়

(গ) নামপ্রকৃতি + বিভক্তি (ঘ) নামপ্রকৃতি + বলক

২২৫. 'শব্দ' ও 'পদ' এর মধ্যে পার্থক্য কী?

(ক) শব্দ মানে বাক্যের অংশ (খ) পদ মানে অভিধানে লেখা শব্দ

(গ) শব্দ রচপত্রের বিষয়, পদ বাক্যতত্ত্বের ✓ (ঘ) শব্দে বিভক্তি থাকে, পদে থাকে না

উপসর্গ দিয়ে শব্দ গঠন

২২৬. কোন অর্থহীন পদাংশ অন্য শব্দের ডুকতে বসে নতুন শব্দ পঠন করে, সেগুলোকে কী বলে?

[বরিশাল বোর্ড ২৪]

(ক) প্রত্যয় (খ) সমাস

(গ) সন্ধি (ঘ) উপসর্গ ✓

২২৭. শব্দের আগে বসে কোনটি?

[ঢাকা বোর্ড ০৩, ৯৩; যশোর বোর্ড ০২, ৯৪; কুমিল্লা বোর্ড ০০; সিলেট বোর্ড ১৭, ৩৯]

(ক) অনুসর্গ (খ) বিভক্তি ✓

(গ) প্রত্যয় (ঘ) উপসর্গ

২২৮. "নিজস্ব কোনো অর্থবাচকতা না থাকলেও, নতুন শব্দ সৃজনের ক্ষমতা আছে"- কোনটির?

[বরিশাল বোর্ড ০৬]

(ক) অনুসর্গের (খ) বিভক্তির

(গ) উপসর্গের ✓ (ঘ) পদাশ্রিত অব্যয়ের

২২৯. কোনটির অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে? / অথবা, যে সকল অব্যয়সূচক পদাংশের অর্থবাচকতা নেই, অর্থদ্যোতকতা থাকে তাদের কী বলে? / অথবা, কোনটির নিজস্ব কোনো অর্থবাচকতা নেই?

[ঢাকা বোর্ড ০৯, ০৭; রাজশাহী বোর্ড ১৭, ১৪; যশোর বোর্ড ০৬; কুমিল্লা বোর্ড ০৩; বরিশাল বোর্ড ০৪; রাজশাহী বোর্ড ১৫]

(ক) শব্দবিভক্তি (খ) ক্রিয়াবিভক্তি

(গ) উপসর্গ ✓ (ঘ) অনুসর্গ

২৩০. অর্থ নেই, কিন্তু অর্থের চেতনা তৈরি করে— [ময়মনসিংহ বোর্ড ২৪]

(ক) অনুসর্গ (খ) উপসর্গ ✓

(গ) বিভক্তি (ঘ) প্রত্যয়

২৩১. বাংলা ভাষার উপসর্গের সংখ্যা কতটি? [ঢাকা বোর্ড ২৪]

(ক) শতাধিক (খ) অর্ধশতাধিক ✓

(গ) সহস্রাধিক (ঘ) অর্ধসহস্রাধিক

২৩২. উপসর্গের কাজ কী?

[ঢাকা বোর্ড ১৫, ০৮, ০৩; যশোর বোর্ড ১১; কুমিল্লা বোর্ড ০৭; রাজশাহী বোর্ড ০৫; দিনাজপুর বোর্ড ১১

(ক) বর্ণ সংকোচন (খ) যদি সংস্থাপন

(গ) নতুন অর্থবোধক শব্দ গঠন ✓ (ঘ) ভাবের পার্থক্য নিরূপণ

২৩৩. শব্দের আদিতে বসে শব্দের অর্থের পরিবর্তন সাধন করে—

[যশোর বোর্ড ০৯; কুমিল্লা বোর্ড ০৭]

(ক) অনুসর্গ (খ) কর্মপ্রবচনীয়

(গ) উপসর্গ ✓ (ঘ) প্রত্যয়

২৩৪. "অ" উপসর্গযোগে পঠিত 'আকাশ' শব্দটি কী চেতনা প্রকাশ করে?

(ক) অজ (খ) অনুচিত

(গ) বৃহৎ ✓ (ঘ) মেধে

২৩৫. 'অপকর্ম' শব্দে 'অপ' উপসর্গটি কী অর্থ প্রকাশ করে?

[ঢাকা বোর্ড ১০; রাজশাহী বোর্ড ১৩]

(ক) নিকৃষ্ট (খ) আকৃষ্ট ✓

(গ) উৎকৃষ্ট (ঘ) বিশিষ্ট

২৩৬. 'অপ' উপসর্গযোগে পঠিত 'অপসংস্কৃতি' শব্দটি অর্থ প্রকাশ করে—

[ময়মনসিংহ বোর্ড ২৩]

(ক) বিকৃত ✓ (খ) তুলা

(গ) বাজে (ঘ) পিছান

২৩৭. 'আরক্ত' শব্দে 'আ' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

[কুমিল্লা বোর্ড ২২; বরিশাল বোর্ড ২৩; দিনাজপুর বোর্ড ২৪]

(ক) অপূর্ণ (খ) বাজে ✓

(গ) অভাব (ঘ) বিপরীত

২৩৮. 'সুনিল' শব্দের 'সু' উপসর্গ কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

[চট্টগ্রাম বোর্ড ১২; বরিশাল বোর্ড ২২]

(ক) খারাপ (খ) উত্তম

(গ) মন্দ ✓ (ঘ) ভালো

২৩৯. কোন উপসর্গ কোন শব্দে ব্যবহৃত হয়েছে? / অথবা, নিচের কোনটি বাংলা উপসর্গযুক্ত শব্দ?

[যশোর বোর্ড ১০; বরিশাল বোর্ড ১৬]

(ক) নীল
(খ) সুনবর ✓
(গ) কর্ণ
(ঘ) নিপুণ

২৪০. উপসর্গ কোন শব্দে ব্যবহৃত হয়েছে? [সিলেট বোর্ড ১৬]

(ক) সুনজর ✓
(খ) কঠিন
(গ) ভদ্র
(ঘ) নিপুণ

২৪১. 'বিপরীত' অর্থে 'পরা' উপসর্গযুক্ত শব্দ-

(ক) পরাকাষ্ঠা
(খ) পরাজয় ✓
(গ) পরাক্রান্ত
(ঘ) পরায়ণ

২৪২. 'নি' উপসর্গযোগে 'নিগার্হস' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

[কুমিল্লা বোর্ড ১২]

(ক) গতি অর্থে
(খ) উত্তম অর্থে
(গ) আতিশয় ✓
(ঘ) নিশ্চয় অর্থে

২৪৩. 'নিজান' শব্দে 'নি' উপসর্গ কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

[ঢাকা বোর্ড ১৪, ৯২; যশোর বোর্ড ০৯; কুমিল্লা বোর্ড ৯৪]

(ক) বিশেষ ✓
(খ) অভাব
(গ) গতি
(ঘ) সাধারণ

২৪৪. কোনটি উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ? [চট্টগ্রাম বোর্ড ০৭]

(ক) বিফল ✓
(খ) লুনি
(গ) লাজ
(ঘ) নজর

২৪৫. 'অনুসরণ' শব্দে 'অনু' উপসর্গ কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

[দিনাজপুর বোর্ড ১৫]

(ক) পিছনে ✓
(খ) সদৃশ
(গ) নিশ্চয়
(ঘ) সহজ

২৪৬. 'সু' উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ- [যশোর বোর্ড ০৮; বরিশাল বোর্ড ০৫]

(ক) নজর ✓
(খ) দিন
(গ) নাম
(ঘ) সুদিন

২৪৭. নিচের কোন শব্দে 'সু' উপসর্গ 'চমৎকার' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

[কুমিল্লা বোর্ড ১৫]

(ক) সুকৌশল ✓
(খ) সুসাধ্য
(গ) সুকৃতি
(ঘ) সুলভ

২৪৮. 'সম্যক' অর্থে উপসর্গের ব্যবহার— [যশোর বোর্ড ০৭]

(ক) অভিজ্ঞ ✓
(খ) অভিভূত
(গ) অভিভাষি
(ঘ) অভিবাদন

২৪৯. কোনটি উপসর্গ?

(ক) রস
(খ) কম
(গ) উক ✓
(ঘ) গদি

২৫০. 'উপভোগ'- এখানে 'উপ' উপসর্গ কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

[দিনাজপুর বোর্ড ২৩]

(ক) সম্যক
(খ) ছোট ✓
(গ) মন্দ
(ঘ) অভাব

২৫১. 'বিপরীত' অর্থে 'পরা' উপসর্গযুক্ত শব্দ কোনটি?

(ক) পরাকাষ্ঠা
(খ) পরাজয় ✓
(গ) পরাক্রান্ত
(ঘ) পরায়ণ

২৫২. 'পরা' উপসর্গযোগে পঠিত 'পরাবাস্তব' শব্দটি অর্থ প্রকাশ করে—

[যশোর বোর্ড ২৪; সিলেট বোর্ড ২৩]

(ক) অর্ধেক
(খ) বিপরীত
(গ) অতিশয় ✓
(ঘ) সম্পূর্ণ

২৫৩. নিচের কোনটি উপসর্গযোগে পঠিত শব্দ? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২৩]

(ক) প্রণতি ✓
(খ) নীলিমা
(গ) বেতানো
(ঘ) নাতিন

২৫৪. 'সুকেশা' শব্দের 'সু' উপসর্গ কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

[চট্টগ্রাম বোর্ড ১০]

(ক) সহজ
(খ) অতিশয়
(গ) আধিক্য
(ঘ) চমৎকার ✓

২৫৫. উপসর্গযোগে পঠিত শব্দ-

[রাজশাহী বোর্ড ০৬; চট্টগ্রাম বোর্ড ০৬; ঢাকা বোর্ড ০০]

(ক) নিকট
(খ) সঠিক ✓
(গ) কাছে
(ঘ) হাসি

প্রত্যয় দিয়ে শব্দ গঠন

এই অধ্যায়ে কোনো বহুনির্বাচনি প্রশ্ন নেই।

সমাস প্রক্রিয়ার শব্দ গঠন

২৫৬. সমাস মূলত কয় প্রকার? [দিনাজপুর বোর্ড ১৬]

(ক) ৫
(খ) ৪ ✓
(গ) ৬
(ঘ) ৩

২৫৭. প্রত্যেক পদের অর্থ প্রাধান্য পায় যে সমাসে সেটি-

[রাজশাহী বোর্ড ০৪; কুমিল্লা বোর্ড ৯৯]

(ক) নিত্য সমাস
(খ) দ্বন্দ্ব সমাস ✓
(গ) বহুব্রীহি
(ঘ) তৎপুরুষ সমাস

২৫৮. কোন সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ উভয়টিরই সমান প্রাধান্য থাকে?

[যশোর বোর্ড ২৩]

(ক) বহুব্রীহি
(খ) কর্মধারয়
(গ) দ্বন্দ্ব ✓
(ঘ) তৎপুরুষ

২৫৯. 'জনা-শ্রুত' কোন শব্দের কোন সমাস?

[যশোর বোর্ড ০৮; চট্টগ্রাম বোর্ড ১৩; বরিশাল বোর্ড ০২]

(ক) সমার্থক
(খ) বিরোধার্থক
(গ) প্রতিপদার্থক ✓
(ঘ) মিলনার্থক

২৬০. 'জমা-খরচ' সমস্তপদটির সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?

[ঢাকা বোর্ড ৯৪; কুমিল্লা বোর্ড ৯২; বরিশাল বোর্ড ১১]

(ক) জমার খরচ
(খ) জমাকে খরচ
(গ) জমা হতে খরচ
(ঘ) জমা ও খরচ ✓

২৬১. কোনটি দ্বন্দ্ব সমাস? [সিলেট বোর্ড ১১]

(ক) বেতাল
(খ) মাতা-পিতা ✓
(গ) রাতকানা
(ঘ) লাল পেড়ে

২৬২. কর্মধারয় সমাসের কোন পদ প্রধান?

[বরিশাল বোর্ড ০৩; দিনাজপুর বোর্ড ১০]

(ক) অন্যপদ
(খ) উভয় পদ
(গ) পূর্বপদ
(ঘ) পরপদ ✓

২৬৩. কোনটি 'পরপদ' প্রধান সমাস?

[রাজশাহী বোর্ড ১৪; চট্টগ্রাম বোর্ড ১৩; সিলেট বোর্ড ০৬]

(ক) কর্মধারয় ✓
(খ) অব্যয়ীভাব
(গ) দ্বন্দ্ব
(ঘ) বহুব্রীহি

২৬৪. কোনটি কর্মধারয় সমাস? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২৪]

(ক) হাতেকলমে
(খ) গোলাভরা
(গ) পদ্ম আঁখি ✓
(ঘ) লাল পেড়ে

২৬৫. সিঁড়ে সে আসু – আলুসিঁড়ে-কী সমাস? [কুমিল্লা বোর্ড ২৩, ১৭]

(ক) দ্বন্দ্ব সমাস
(খ) কর্মধারয় সমাস ✓
(গ) বিগ সমাস
(ঘ) রূপক সমাস

২৬৬. নিচের কোনটি বিগ কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ? [বরিশাল বোর্ড ২৪]

(ক) শশব্যস্ত ✓
(খ) চৌরাস্তা
(গ) আলুসিঁড়ে
(ঘ) মনমাঝি

২৬৭. 'যার সঙ্গে তুলনা করা হয়'- তাকে কী বলে? [দিনাজপুর বোর্ড ২৩]

(ক) তুলনীয়
(খ) উপমান ✓
(গ) উপমেয়
(ঘ) রূপক

২৬৮. উপমান কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ-

[ঢাকা বোর্ড ৯৬; রাজশাহী বোর্ড ১১; যশোর বোর্ড ০০; কুমিল্লা বোর্ড ২৪; চট্টগ্রাম বোর্ড ০৪]

(ক) বৌ-ভাত
(খ) মুখচন্দ্র
(গ) মহানবি
(ঘ) কাজলকালো ✓

২৬৯. 'গোলাপ নামের ফুল = গোলাপফুল' কোন সমাসের উদাহরণ?

[ময়মনসিংহ বোর্ড ২৪]

(ক) দ্বন্দ্ব
(খ) বহুব্রীহি
(গ) তৎপুরুষ
(ঘ) কর্মধারয় ✓

২৭০. 'কাজল-কালো'-এর সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?

[ঢাকা বোর্ড ০৩; কুমিল্লা বোর্ড ৯৩; বরিশাল বোর্ড ০১]

(ক) কাজলের মতো কালো ✓
(খ) কাজল রূপ কালো
(গ) কাজল ও কালো
(ঘ) কালো যে কাজল

২৭১. নিচের কোন সমস্ত পদটি উপমান কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ?

[রাজশাহী বোর্ড ২৩]

(ক) মুখচন্দ্র
(খ) শশব্যস্ত ✓
(গ) পদাঙ্গুলি
(ঘ) সিংহপুরুষ

২৭২. উপমান কর্মধারয় সমাস কোনটি?

[ঢাকা বোর্ড ০৭; যশোর বোর্ড ০৮,৯৬; কুমিল্লা বোর্ড ০৭; চট্টগ্রাম বোর্ড ০৮, ০৬, ০০; বরিশাল বোর্ড ১২,

(ক) মুখচন্দ্র
(খ) ক্রোধানল
(গ) অরুণরাগ/মনশান/তুষারপুত্র/কাজলকালো ✓
(ঘ) মনমাঝি/চিরসুখী

২৭৩. কোন সমাসে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হয়?

[ঢাকা বোর্ড ১৫; কুমিল্লা বোর্ড ১৬]

(ক) উপমান কর্মধারয়(ক)
(খ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
(গ) রূপক কর্মধারয় ✓
(ঘ) উপমিত কর্মধারয়

২৭৪. নিচের কোনটিতে উপমেয় পদের সাথে উপমান পদের অভেদ কল্পনা করা হয়েছে?

[সিলেট বোর্ড ২৩]

(ক) চৌরাস্তা
(খ) বিষাদসিন্ধু ✓
(গ) চাঁদমুখ
(ঘ) নয়হয়

২৭৫. উপমিত কর্মধারয় সমাস- [কুমিল্লা বোর্ড ১৩]

(ক) তুষারের ন্যায় ভভ ✓
(খ) পুকুর সিংহের ন্যায়
(গ) মনরূপ মাঝি
(ঘ) ওক্ষের ন্যায় রাঙা

২৭৬. 'চন্দ্রমুখ' শব্দের ব্যাসবাক্য কোনটি?

[ঢাকা বোর্ড ১১; যশোর বোর্ড ১১; কুমিল্লা বোর্ড ১৯; সিলেট বোর্ড ০৮, ০৭; চট্টগ্রাম বোর্ড ২০]

(ক) চন্দ্রের ন্যায় মুখ ✓
(খ) চন্দ্র রূপ মুখ
(গ) মুখ চন্দ্রের ন্যায়
(ঘ) মুখ ও চন্দ্র

২৭৭. নিচের কোনটি উপমিত কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ?

[চট্টগ্রাম বোর্ড ২৩]

(ক) চন্দ্রমুখ ✓
(খ) শশব্যস্ত
(গ) কাজলকালো
(ঘ) তুষারভরা

২৭৮. তৎপুরুষ কর্মধারয় সমাস কোনটি? [রাজশাহী বোর্ড ২৪; সিলেট বোর্ড ১৫]

(ক) মনমাঝি
(খ) চন্দ্রমুখ ✓
(গ) ঘরজামাই
(ঘ) কাজলকালো

২৭৯. 'মুখ চেহারার নাম'- কোন কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ?

[বরিশাল বোর্ড ২০]

(ক) মধ্যপদলোপী
(খ) উপমান
(গ) রূপক
(ঘ) উপমিত ✓

২৮০. কোন সমাসে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হয়?

[ঢাকা বোর্ড ১৫; কুমিল্লা বোর্ড ১৫]

(ক) উপমান কর্মধারয়
(খ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
(গ) রূপক কর্মধারয় ✓
(ঘ) উপমিত কর্মধারয়

২৮১. 'মলিনা'-এর সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি? [ঢাকা বোর্ড ০৮]

(ক) মন যে মাঝি
(খ) মন মাঝির ন্যায়
(গ) মন রূপ মাঝি ✓
(ঘ) মন ও মাঝি

২৮২. তৎপুরুষ সমাসের কোন পদ প্রধান? [সিলেট বোর্ড ০৪]

(ক) পূর্বপদ
(খ) পরপদ ✓
(গ) অন্যপদ
(ঘ) উভয়পদ

২৮৩. 'ধানক্ষেত' কোন সমাসের উদাহরণ?

(ক) দ্বন্দ্ব
(খ) কর্মধারয়
(গ) তৎপুরুষ ✓
(ঘ) বহুব্রীহি

২৮৪. 'রাজপথ' কোন সমাস? [ঢাকা বোর্ড ২৪; সিলেট বোর্ড ১৩]

(ক) ষষ্ঠী তৎপুরুষ
(খ) চতুর্থী তৎপুরুষ
(গ) দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
(ঘ) তৃতীয়া তৎপুরুষ ✓

২৮৫. 'রাজপথ'-এর ব্যাসবাক্য হবে- [কুমিল্লা বোর্ড ৯৯; দিনাজপুর বোর্ড ০৯]

(ক) রাজাদের পথ
(খ) রাজা নির্মিত পথ
(গ) রা পথ
(ঘ) পথের রাজা ✓

অনুচ্ছেদ

৪৮ টি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মিছিলে পুলিশের গুলিতে নিহত হন সালাম-বরকত-রফিক-জব্বারসহ বেশ কয়েকজন। মাতৃভাষার জন্য তাঁদের আত্যাগ ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা। তখন থেকেই দিনটি শহিদ দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর পারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর সাধারণ সম্মেলনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর ২০০০ সাল থেকে সারা বিশ্বে দিনটি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে। একুশে ফেব্রুয়ারিকে এভাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার মধ্য দিয়ে ভাষা-আন্দোলনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মেলে। এর একটি নতুন মাত্রাও তৈরি হয়। পৃথিবীর মাতৃভাষাসমূহের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে এবং পৃথিবীর কোনো ভাষা যাতে হারিয়ে না যায় তা রোধ করতে এই দিবস অনুপ্রেরণার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। তাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হয়। 'শহিদ দিবস' বাংলাদেশের জাতীয় দিবস, যা সমগ্র বিশ্বের 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে একটি ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়

উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত বহু বিদ্যা চর্চার প্রতিষ্ঠানকে বলে বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিকে যেমন জ্ঞান বিতরণ করা হয়, অন্যদিকে তেমন নতুন জ্ঞান সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণিগুলোতে জ্ঞান বিতরণ করা হয় এবং যাঁরা নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করেন তাঁদের এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়। যাঁরা জ্ঞান বিতরণের সঙ্গে জড়িত তাঁরা অধ্যাপক নামে এবং যাঁরা জ্ঞান সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত তাঁরা গবেষক নামে পরিচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাশাখাগুলোকে সাধারণত মানবিক, সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কৃষি, আইন, চারুকলা, প্রযুক্তি, চিকিৎসা প্রভৃতি শাখায় বা অনুষদে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। প্রাচীন কালে উপমহাদেশে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল যার নাম নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। এর বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান বাংলাদেশের সীমানার অদূরে। পৃথিবীর প্রাচীনতম যে বিশ্ববিদ্যালয়টি এখনো চালু আছে তার নাম আল কারাওয়াইন বিশ্ববিদ্যালয়। এটি মরক্কোর ফেজ শহরে অবস্থিত। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯২১ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দেড় শতাধিক। এগুলো বিভিন্ন শ্রেণিনামে পরিচিত: স্বায়ত্তশাসিত, সরকারি, বেসরকারি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কৃষি, প্রকৌশল, মেডিকেল, বিশেষায়িত, কেন্দ্রীয়, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি। জ্ঞানচর্চার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বিশ্বকে কল্যাণমূলক ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

বৈশাখী মেলা

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে দেশের শহর ও গ্রামের বিভিন্ন স্থানে বৈশাখী মেলা বসে। এ মেলা অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা নেই; কোথাও এক দিন, কোথাও এক সপ্তাহ, আবার কোথাও মাসব্যাপী বৈশাখী মেলা চলে। নতুন বছরে মানুষের আনন্দ-অনুভূতি প্রকাশের একটা উপলক্ষ এই বৈশাখী মেলা। মেলায় আগত পরিচিতজনেরা পরস্পরের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও লোক-উৎসবের মাধ্যমে এই মিলনমেলা আনন্দমুখর হয়ে ওঠে। বলীখেলা, ঘোড়দৌড়, লাঠিখেলা, হাডুডু প্রভৃতি ক্রীড়ানুষ্ঠান বৈশাখী মেলাকে আকর্ষণীয় করে তোলে। মেলা উপলক্ষে নানা ধরনের লোকগানের আসর বসে। সাধারণত গ্রামের হাটে, বাজারে, নদীর তীরে বা মন্দির প্রাঙ্গণে খোলা আকাশের নিচে বৈশাখী মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় যেসব পণ্য বিক্রি হয়, এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প ও কুটিরশিল্পের পরিমাণ বেশি। বৈশাখী মেলায় গিয়ে তালপাতায় তৈরি হাতপাখা কেনেন না এমন লোকের সংখ্যা খুব কম। বিভিন্ন ধরনের মুখরোচক হালকা খাবার ও মিষ্টান্ন মেলার আকর্ষণ বাড়ায়। মেলায় বিভিন্ন ধরনের পণ্যসামগ্রীর কেনা-বেচা হয় ঠিকই, তবে বিভিন্ন বয়সের নারীপুরুষের সমাবেশ বৈশাখী মেলার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ।

বইমেলা

বইমেলা হলো বইকে উপলক্ষ করে লেখক ও পাঠকের মিলনমেলা। আনন্দঘন পরিবেশে বই কেনা-বেচার সুযোগ ঘটে বইমেলায়। এই মেলাতে বইয়ের প্রকাশকগণ তাঁদের নতুন ও পুরনো বই নিয়ে দোকান সাজান, পাঠক সেখান থেকে তাঁর পছন্দের বই দেখেশুনে কিনতে পারেন। এটা বইমেলার সবচেয়ে বড়া সুবিধা। জার্মানির ফ্রাংকফুর্ট শহরে বিশেষ বৃহত্তম বইমেলার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশে বইমেলার সূচনা হয় ১৯৭২ সালে মুক্তধারার প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহার উদ্যোগে। ১৯৭৮ সাল থেকে শুরু হয় বাংলা একাডেমি 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'। এই মেলায় শুধু বই কেনাবেচাই নয়, নানা ধরনের সাংস্কৃতিক ও একাডেমিক কর্মকাণ্ড বাংলা একাডেমি গ্রহণ করে। ২০১৪ সাল থেকে বইমেলা বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে পার্শ্ববর্তী সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী প্রতি বছর এই মেলার উদ্বোধন করেন। বইমেলা মানুষের মধ্যে পাঠাভ্যাস বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; বিশেষভাবে শিশু-কিশোররা বাবা-মার সাথে বইমেলায় গিয়ে নিজেদের পছন্দের বইটি সংগ্রহ করতে পারে, নতুন নতুন বইয়ের সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়। বইমেলাকে কেন্দ্র করে অনেক লেখক তাঁদের নতুন বই প্রকাশ করেন; পাঠকও নতুন নতুন ধারণার সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন।

জাদুঘর

জাদুঘর বলতে এমন স্থাপনা বা প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেখানে সভ্যতা ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ পুরাকীর্তি সংরক্ষণ করা হয়। অতীত কালের গুরুত্বপূর্ণ পুরাকীর্তি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট তুলে ধরার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করাই জাদুঘর প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য। প্রাচীন মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমান বিশ্বের বিখ্যাত জাদুঘরগুলোর মধ্যে ফ্রান্সের লুভর ও গিমে মিউজিয়াম, ব্রিটেনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ইতালির উফিজি মিউজিয়াম, রাশিয়ার হার্মিটেজ মিউজিয়াম উল্লেখযোগ্য। ঢাকার শাহবাগে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জাদুঘর অবস্থিত। এর নাম বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর। সুদূর অতীত থেকে নিকট অতীত পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সব ধরনের পুরাকীর্তি এখানে সংরক্ষিত আছে। বাংলাদেশে আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জাদুঘরের মধ্যে রয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, চট্টগ্রামের জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর, ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, নারায়ণগঞ্জ বাংলাদেশ লোকশিল্প জাদুঘর ইত্যাদি। জাদুঘরের পুরাকীর্তিসমূহ নিয়মিত প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকে। যে জাতির ঐতিহ্য যতো সমৃদ্ধ, সে জাতির জাদুঘরও ততো সমৃদ্ধ।

সুন্দরবন

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অবস্থিত বিস্তৃত একটি ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন নামে পরিচিত। নানা ধরনের গাছপালায় পরিপূর্ণ এই সুন্দরবনে বিচিত্র বন্যপ্রাণী বাস করে। সুন্দরবনের মোট আয়তন প্রায় চার হাজার বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ বাংলাদেশে এবং বাকি অংশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার অংশবিশেষ নিয়ে বাংলাদেশ অংশের সুন্দরবন বিস্তৃত। প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার হিসেবে সুন্দরবন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখান থেকে সংগৃহীত হয় নানা ধরনের কাঠ, মধু, মোম ও মৎস্য। প্রায় চারশো নদী ও খাল এবং প্রায় দুইশো দ্বীপ রয়েছে সুন্দরবনে। সুন্দরবনে যেসব গাছ জন্মে এর মধ্যে সুন্দরী, গোলপাতা, কেওড়া, গেওয়া, গরান, বাইন, ধুন্দুল, পশুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই বনে বাস করে রেয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, মায়া হরিণ, বন্য শূকর, বানর, বনিবড়াল, সজারু ইত্যাদি বনপ্রাণী। বিচিত্র প্রজাতির পাখির কলকাকলিতে সুন্দরবন মুখর থাকে। ১৯৯৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর ইউনেস্কো সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

রেলগাড়ি

সমান্তরাল ধাতব পাতের উপর দিয়ে চলা গাড়িকে রেলগাড়ি বলে। রেলগাড়িতে অনেকগুলো কামরা বা বগি সারিবদ্ধভাবে যুক্ত থাকে। বাষ্পীয় ইঞ্জিন উদ্ভাবনের সূত্র ধরে রেলগাড়ির জন্ম। বর্তমান বিশ্বে যাত্রী ও মালামাল পরিবহণের কাজে এই গাড়ি অত্যন্ত জনপ্রিয়। জর্জ স্টিফেনসনের প্রচেষ্টায় ইংল্যান্ড ১৮২৫ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর বিশ্বের প্রথম রেলগাড়ি চলাচল শুরু করে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে ভারতীয় উপমহাদেশে রেলগাড়ির যাত্রা শুরু হয়। ১৮৬২ সালে দর্শনা থেকে কুষ্টিয়ার জগতি পর্যন্ত ৫৩.১১ কিলোমিটার রেললাইন স্থাপন করা হয়। এটিই বাংলাদেশের প্রথম রেল পথ। বাংলাদেশে রেলগাড়ি নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম বাংলাদেশ রেলওয়ে। এটি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। রেলপথ তিন ধরনের: ব্রডগেজ, মিটারগেজ ও নারোগেজ। বর্তমানে বাংলাদেশে ব্রডগেজ ও মিটারগেজ, এই দুই ধরনের রেলপথ চালু আছে। বাংলাদেশের বেশিরভাগ জেলায় বর্তমানে রেলগাড়ি চলাচল করে, এছাড়া পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সঙ্গেও বাংলাদেশের রেলযোগাযোগ রয়েছে। রেলগাড়িতে ভ্রমণ আনন্দদায়ক ও নিরাপদ।

স্বাধীনতা দিবস

ছাব্বিশে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করলেও ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে সামরিক সরকার ষড়যন্ত্র শুরু করে। ওই সামরিক সরকার নিয়ন্ত্রিত হতো পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা এবং পশ্চিম পাকিস্তানিদের স্বার্থে। ক্ষমতাসীনরা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পঁচিশে মার্চ মধ্যরাতে বাঙালিদের উপর গণহত্যা শুরু করে। ১৯৪৭ সাল থেকে চব্বিশ বছর ধরে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক শ্রেণি পূর্ব বাংলার উপরে যে নিপীড়ন ও শোষণ চালিয়েছে, নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে তার অবসান ঘটে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়, তাই এই দিন হলো বাংলাদেশের বিজয় দিবস। অন্যদিকে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকেই এ দেশের মানুষ স্বাধীন, কেননা ঐ তারিখেই স্বাধীনতার জন্য শুরু হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ।

জাতীয় পতাকা

জাতীয় পতাকা একটি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। পৃথিবীর প্রতিটি দেশের আলাদা জাতীয় পতাকা রয়েছে। সাধারণত এক খণ্ড কাপড় দিয়ে জাতীয় পতাকা তৈরি করা হয়। এর আকার সুনির্দিষ্ট। আয়তাকার পতাকাই বেশি। যে দণ্ডের সঙ্গে পতাকাটি বেঁধে টাঙানো হয়, সেই দণ্ডকে বলে পতাকা-দণ্ড। সরকারি অফিস-আদালত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এছাড়া জাতীয় দিবসগুলোতে দেশের সর্বত্র জাতীয় পতাকা শোভা পায়। আন্তর্জাতিক খেলাধুলার সময়ে কোনো দেশের খেলোয়াড়দের সমর্থন করার সময় সমর্থকেরা সেই দেশের পতাকা উড়িয়ে থাকে। জাতীয় শোক দিবসে এবং সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী কোনো শোক পালন করার সময় জাতীয় পতাকাকে অর্ধনমিত করা হয়, অর্থাৎ পতাকা-দণ্ডের উপর দিকে পতাকার প্রস্থের সমান অংশ বাদ দিয়ে পতাকাটি টাঙানো হয়। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাত ১০ : ৬। এর পাঁচটি পরিমাপ রয়েছে ১০ ফুট: ৬ ফুট, ৫ ফুট: ৩ ফুট, ২.৫ ফুট: ১.৫ ফুট, ১৫ ইঞ্চি: ৯ ইঞ্চি, এবং ১০ ইঞ্চি: ৬ ইঞ্চি। 'ভজাতরের জাতীয় পতাকা হইতেছে সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবৃত্তের একটি ভরাট বৃত্ত।' বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার সবুজ রং সবুজ প্রকৃতি ও তারুণ্যকে নির্দেশ করে এবং উদীয়মান সূর্যের মতো এর লাল বৃত্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারীদের নির্দেশ করে।

জাতীয় সংগীত

রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত দেশপ্রেমমূলক গানকে জাতীয় সংগীত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির সূচনায় বা জাতীয় দিবসসমূহ পালনের সময়ে বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিদিন সকালের সমাবেশে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সময়ে সমবেত সকলে উঠে দাঁড়াতে হয়। এটা দেশের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সামিল। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় খেলা শুরুর আগেও প্রতিযোগীরা নিজ নিজ দেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের প্রথম লাইন: 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।' বাউল গানের সুরে গানটি রচনা করেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৭২ সালের ১৩ই জানুয়ারির স্বাধীন বাংলাদেশের মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে গানটিকে জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দেওয়া হয়। গানটির কথায় বাংলাদেশ এবং বাংলা ভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রতিফলিত হয়েছে। এই ধরনের জাতীয় সংগীত দেশের মানুষকে নিজ দেশের প্রতি দায়বদ্ধ হতে শেখায়।

কম্পিউটার

কম্পিউটার আধুনিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন। কম্পিউটার শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'কম্পিউট' থেকে, যার অর্থ হিসাব বা গণনা করা। প্রথম দিকে কম্পিউটার শুধু হিসাব করার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু কালক্রমে কম্পিউটারের এমন বিকাশ ঘটেছে যে, একুশ শতকের সূচনায় এসে কম্পিউটার মানুষের জীবনযাত্রার সকল কাজের নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছে। অসংখ্য বিজ্ঞানীর বহু বছরের সাধনার ফলে কম্পিউটার প্রযুক্তির এই অভাবনীয় বিকাশ ঘটেছে। দাপ্তরিক কাজ, লেখালেখি, শিক্ষা, প্রকাশনা, বাণিজ্য, যোগাযোগ, বিনোদনসহ সব ধরনের কাজ এখন পুরোপুরি কম্পিউটার-নির্ভর। নানা ধরনের তথ্য বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনের কাজে শিক্ষার্থী ও গবেষকেরে কম্পিউটারের সাহায্য নিতে হয়। কম্পিউটারের বাহ্যিক যন্ত্রাংশকে বলে হার্ডওয়্যার বা যন্ত্রপাতি। হার্ডওয়্যারের মধ্যে থাকে কিবোর্ড, মাউস, র্যাম, মাদারবোর্ড, মনিটর, প্রিন্টার ইত্যাদি। যেসব প্রোগ্রাম দিয়ে কম্পিউটার কাজ করে সেগুলোকে বলে সফটওয়্যার। বাংলাদেশের বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত করতে চায়; এর মানে কম্পিউটার প্রযুক্তির যাবতীয় সুবিধা দেশের সব মানুষের কাছে সহজলভ্য করে তোলা।

মোবাইল ফোন

এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সহজে বহন করা যায় এমন ফোনকে বলে মোবাইল ফোন। মোবাইল ফোন আবিষ্কারের আগে দূরবর্তী কারো সঙ্গে কথা বলার জন্য ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে টেলিফোন নামক যন্ত্র রাখতে হতো। এর সংক্ষিপ্ত নাম ফোন। বিভিন্ন বাড়ি বা অফিসে তারের মাধ্যমে ফোনগুলো যুক্ত থাকত। অন্যদিকে মোবাইল ফোন তারবিহীন প্রযুক্তি হওয়ায় এটি যেখানে খুশি সেখানে বহন করা যায়। মোবাইল ফোনকে কখনো সেলুলার ফোন, হ্যান্ড ফোন বা মুঠোফোন নামে অভিহিত করা হয়। মোবাইল ফোনে আজকাল কথা বলার পাশাপাশি আধুনিক কম্পিউটার প্রযুক্তির যাবতীয় সুবিধা ভোগ করা যায়। এই সুবিধা আছে যেসব মোবাইল ফোনে, সেগুলোকে বলে স্মার্ট ফোন। এই স্মার্ট ফোনে কথা বলা যায়, ক্ষুদে বার্তা আদান-প্রদান করা যায়, ই-মেইল করা যায়, বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে পৃথিবীর যাবতীয় তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়, গান শোনা যায়, নাটক দেখা যায়, রেডিও শোনা যায়, টিভি দেখা যায়। অপরাধী শনাক্ত করার কাজেও আজকাল মোবাইল ফোন গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে মোবাইল ফোন প্রথম চালু হয় ১৯৯৩ সালে। প্রায় ত্রিশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় দশ কোটি ছাড়িয়ে গেছে।

পদ্মা নদী

পদ্মা বাংলাদেশের একটি প্রধান নদী। ভারতের গঙ্গা নদীর ধারা বাংলাদেশে প্রবেশ করার সময়ে পদ্মা নাম গ্রহণ করে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে চাঁদপুরের কাছে মেঘনা নদীতে মিলিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এটি পদ্মা নামে পরিচিত। উৎপত্তি ও প্রবাহ বিবেচনায় পদ্মা আন্তর্জাতিক একটি নদীর অংশবিশেষের নাম। মূল নদীটির নাম গঙ্গা। গঙ্গা নদীর উৎস হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ। বাংলাদেশে প্রবেশের সময়ে গঙ্গার দক্ষিণমুখী একটি শাখা ভারতী নাম দিয়ে পশ্চিমবেঙ্গর মধ্য দিয়ে সাগরে মেশে। মূল ধারাটি পদ্মা নাম নিয়ে গোয়ালন্দের কাছে পৌঁছানোর পর সেখানে উত্তর দিক থেকে আসা যমুনা নদী তার সঙ্গে মেশে। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ শহর রাজশাহী পদ্মা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। পদ্মা নদীর সর্বোচ্চ গভীরতা দেড় হাজার ফুটের বেশি এবং গড় গভীরতা প্রায় এক হাজার ফুট। মালদহ জেলার ফারাক্কাবাদে পদ্মা নদীর সূচনায় একটি বাঁধ দিয়ে ভারত সরকার পদ্মা নদীর পানিকে নিয়ন্ত্রণ করে। পদ্মা নদীর উপরে তৈরি হয়েছে একাধিক রেল ও সড়ক সেতু: একটি ঈশ্বরদীর কাছে এবং অন্যটি মাওয়ার কাছে। পদ্মা নদীর ইলিশের স্বাদ বিশ্বজোড়া। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাঙালির আত্মপরিচয়ের অন্যতম উপাদান হিসেবে পদ্মা নদীর নাম উচ্চারিত হতো।

জন্মদিনের সন্ধ্যা

প্রতেক মানুষের কাছে প্রিয় তার জন্মদিন। এই দিনের সন্ধ্যায় তার প্রিয়জনেরা যদি আয়োজন করে জন্মদিনের অনুষ্ঠান, তাহলে এর চেয়ে আনন্দের আর কী থাকে! জন্মদিনের সন্ধ্যায় আমন্ত্রিতরা যখন একে একে হাজির হয়, শুভেচ্ছা জানায়, স্মারক হিসেবে কিছু না কিছু উপহার হাতে তুলে দেয়, তখন তা মনকে খুশিতে ভরিয়ে দেয়। এক পর্যায়ে ফুঁ দিয়ে বাতি নিভিয়ে কেক কাটা হয়। জন্মদিনের গান আর করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে ঘর। সকলের চোখেমুখে বেয়ে যায় আনন্দের বন্যা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেক কাটার পরে থাকে নৈশভোজ। নৈশভোজে থাকে ভালো ভালো খাবারের ব্যবস্থা। সবার জন্মদিনের সন্ধ্যা যে এমন আনন্দের সঙ্গে কাটে, তা নয়। যাদের প্রিয়জনেরা সচ্ছল নয়, তাদের জন্মদিনের সন্ধ্যা হয়তো কোনো রকম আয়োজন ছাড়াই যায়। তবে আয়োজন হোক বা না হোক, জন্মদিনের সন্ধ্যা মানে জীবন থেকে একটা বছর হারিয়ে যাওয়া আর নতুন একটা বছরের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

বিজয় দিবস

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। এক মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এদেশের মানুষ হানাদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে তাই এ দিনটি 'বিজয় দিবস' হিসেবে পালিত হয়। বর্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর আমরা এই দিনটি পেয়েছিলাম। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আমাদের দেশের সাহসী ছেলেরা স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের শহিদ। আমরা তাঁদের সাহসী যুদ্ধ এবং সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের জন্য গর্বিত। বিজয় দিবস একটি জাতীয় দিবস এবং প্রতিবছর আমরা এ দিনটি সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে পালন করি। আমরা এ দিনটি অত্যত ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে পালন করি। আমরা শহিদদের বিদেহী আত্মার জন্য দোয়া করি। দেশের জন্য ভালো কিছু করতে শহিদদের স্মৃতি আমাদের সব সময় উৎসাহিত করে। তাঁদের আত্মত্যাগ মাতৃভূমির মর্যাদা রক্ষার কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। এই মহান বিজয় দিবস অন্যায় অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে বিজয়ের প্রতীক।

বাংলা নববর্ষ

বাংলা নববর্ষ বাঙালির প্রাণের উৎসব। পয়লা বৈশাখে উৎসব পালিত হয়। পৃথিবীর যেখানে যত বাঙালি আছে, তারা সবাই উৎসবমুখর পরিবেশে বাংলা নববর্ষ পালন করে। বাংলাদেশে একসময় এ দিনে 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠান হতো জাঁকজমকভাবে। এখন হালখাতা, মঙ্গল শোভাযাত্রা, কবিগান, কীর্তন, যাত্রা, বৈশাখী মেলা, আবৃত্তি-নাচ-গানে মুখরিত থাকে সারা দেশ। কোনো কোনো এলাকায় নৌকাবাইচ, হাডুডু, ষাঁড়ের লড়াই, মোরেগের লড়াই ইত্যাদি খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পালন করে তিন দিনব্যাপী আনন্দময় 'বৈসাবি' উৎসব। পণ্ডিতরা মনে করেন মুঘল সম্রাট আকবর বাংলা সন চালু করেন। এ দিনটি যেমন আনন্দ উল্লাসের জন্য তেমনই পরস্পর কুশল বিনিময় ও কল্যাণ কামনার জন্য। আমরা একে অনেক বলি- শুভ নববর্ষ। এ দিনে শহরাঞ্চলে পান্তা-ইলিশ খাওয়ার চল হয়েছে ইদানীং। নতুন অথবা সুন্দর জামাকাপড় পরে সব বয়েসের মানুষ বাংলা নববর্ষে আনন্দে মেতে ওঠে। বাংলা নববর্ষ এখন আমাদের প্রধান জাতীয় উৎসব।

বিদ্যালয়ের শেষ দিন

'বিদ্যালয়ের শেষ দিন' কথাটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কেননা বিদ্যালয়ের সাথে জড়িয়ে থাকে কৈশোরের আবেগ, ভালোবাসা, ভালোলাগা, দুঃখ-কষ্টের নানা অম্ল-মধুর স্মৃতি। সেসব স্মৃতি বিদায়ের দিনে খুব কষ্ট দেয়, বেদনার্ত করে, অশ্রু ঝরায়, আবেগ-আপ্লুত করে। মনে পড়ে বিদ্যালয়ের প্রথম দিনের কথা। সেদিন মনে ছিল অজানা ভয়, প্রশ্ন, কত টেনশন। কিন্তু হেডস্যারের মিষ্টি কথা, মধুর ব্যবহার সব ভুলিয়ে দিয়েছে। মনে মনে সেদিনই এই স্কুলটাকে আপন করে নিয়েছি। প্রথম দিনের ক্লাসে নতুন ড্রেস, নতুন ব্যাগভর্তি বই-খাতা-কলমসহ এসে নতুন বন্ধুদের সাথে খুব ভালো লেগেছিল। স্যারেরাও সবার পরিচয় জেনে বাবার মেতা আদর করে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। এক এক করে উপরের ক্লাসে উঠে গেছি আর সবকিছু নতুন মনে হয়েছে। স্যারদের গল্পের মেতা করে পাঠদান, পরীক্ষাতলায় কঠোরতা, খেলাধুলা-পিকনিকে বন্ধুর মেতা মজা করার কথা খুব মনে পড়ছে। দু-চারদিন মারও খেয়েছি, কিন্তু তা কখনো বাধাহত করেনি। তা মনে হয়েছে খুবই দরকারি। ফলে রেজাল্ট ভালো হয়েছে, পুরস্কৃত হয়েছি প্রতিবছর। এছাড়া কবিতা আবৃত্তি, রবীন্দ্র-নজরুলসংগীত গাওয়া, নাটকে অভিনয় করা, বিতর্কে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে স্যারদের উৎসাহ আর প্রশিক্ষণের কথা কোনোদিনই ভুলব না। এ দিনে স্যারেরা নানা স্মৃতির কথা তুলে ধরেছেন, উপদেশ দিয়েছেন, বুকে জড়িয়ে ধরে দোয়া করেছেন আমাদেরকে। বিদ্যালয়ের প্রতিটি কক্ষ, সবুজ ঘাসভরা মাঠ, চারিদিকের গাছপালা আমাদের স্মৃতির সাথে জড়িয়ে আছে। এসব ছেড়ে চলে যাওয়া বড়ই কঠিন। তবু ভবিষ্যৎ জীবন নির্মাণের প্রয়োজনে যেতে হবে। যেখানেই থাকি না কেন বিদ্যালয়ের সব স্মৃতি জেগে থাকবে আমাদের মনে চিরদিন।

ইন্টারনেট

আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য মাধ্যম। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে এটি একটি প্রযুক্তিনির্ভর তথ্যবহুল মাধ্যম। বর্তমান বিশ্বে ইন্টারনেট একটি বহুল আলোচিত গতিশীল মাধ্যম। এটি একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক কার্যক্রম। এটি কম্পিউটারের সাহায্যে পরিচালিত হয়। ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে চোখের পলকে সারা বিশ্বের সংবাদ ও মতামত আমাদের কাছে এসে পৌঁছে। ইন্টারনেটের সংবাদ পরিক্রমা বিধান সংবলিত নির্দেশাবলির মাধ্যমে আমরা খুব সহজে ও দ্রুত বিশ্বের যেকোনো দেশের সংবাদপত্রসমূহ পড়তে পারি। টেলিনেট সফটওয়্যার আমাদের দেশ বিদেশে অবস্থানরত আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে কথা বলতে সাহায্য করে। ফাইল আদান-প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশাবলি থাকার কারণে আমরা এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে ফাইল আদান-প্রদান করতে পারি। ইন্টারনেটে গল্প করা সংক্রান্ত নির্দেশাবলি থাকায় আমরা যেকোনো স্থানে বসে আমাদের প্রিয়জনদের সাথে গল্প করতে পারি। অতএব, আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটি কাজগুলো থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংক, বিমা, অফিসের কাজকর্ম, গবেষণা, প্রযুক্তি ও শিক্ষা সংক্রান্ত প্রায় সব কাজই ইন্টারনেটের মাধ্যমে সমাধান করতে পারি। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলাই ইতোমধ্যে ইন্টারনেট কমার্শিয়ের আওতায় এসে গেছে। ইন্টারনেট উন্নত জীবন ও বিশ্ব ব্যবস্থাপনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। অদূর ভবিষ্যতে ইন্টারনেটের সুবিধা বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষের কাছে পৌঁছাবে এবং মানুষের জীবন আরও সুখময় ও সমৃদ্ধ হবে।

শিশুশ্রম

শিশুশ্রম একটি সামাজিক ব্যাধি। আর্থ-সামাজিক বৈষম্য, সম্পদের অসম বণ্টন, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে ফুলের মতো কোমল নিপাপ শিশুদের কচি কচি হাতগুলো কঠোর শ্রমের হাতিয়ার হয়ে উঠতে বাধ্য হয়। ফলে তাদের সুপ্ত প্রতিভা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। ছোটখাটো কল-কারখানা থেকে শুরু করে পথর ভাঙা, ফেরি করা, ভিক্ষাবৃত্তি করা, বাসা-বাড়িতে কাজ করা এবং গার্মেন্টস, গ্যারেজ, দোকানপাট, হোটেল-রেস্তুরেন্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিশুদের শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, পূর্ণবয়স্ক মানুষের জন্য যেসব কাজ ঝুঁকিপূর্ণ সেসব কাজে অবলীলায় শিশুদের নিয়োগ করা হয়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এবং জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত মানুষের যেকোনো ধরনের, শারীরিক ও মানসিক শ্রমে নিয়োগকে শিশুশ্রম বলে উল্লেখ করেছে তা নিষিদ্ধ করেছে এবং বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষর করে জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করেছে এবং এদেশে শিশুশ্রম ব্যাপকভাবে চলছে। শিশুশ্রমের কারণে শিশুদের অপরিণত দেহ ও কচি মন নিংড়িয়ে হেতু থাকে এবং দীর্ঘদিনের পুঁজিভূত শক্তির ভারে এরা অকালে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। তাই এই অমানবিক কাজ বন্ধের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত শিশু ও নারী নির্যাতন আইন প্রয়োগে আরও কঠোরতা অবলম্বন করতে হবে। শিশুশ্রম রোধকল্পে আন্তর্জাতিক আইন ও নীতির প্রতি সবাইকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে। শিশুশ্রম ও নির্যাতন রোধে নতুন আইন প্রণয়ন এবং সেই আইনের সুবিধা যাতে শ্রমপীড়িত শিশুরা পায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে। আজকের শিশুই আগামী দিনের দেশ ও জাতির কর্ণধার। তাদের ওপরে নির্ভর করছে দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি। তাই আমাদের সবারই উচিত হবে শিশুদের জন্য কল্যাণকর পরিবেশ নিশ্চিত করা।

খাদ্যে ভেজাল

খাদ্য খেয়ে মানুষ বেঁচে থাকে। খাঁটি খাবার খেয়ে মানুষ সুস্থ থাকে। মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য নির্ভেজাল খাদ্যের বিকল্প নেই। কিন্তু এই নির্ভেজাল খাদ্যসামগ্রী পাওয়াই এখন কঠিন। কারণ এমন কোনো খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যাবে না যাতে কোনো ভেজাল নেই। অধিক মুনাফার জন্য একশ্রেণির মানুষের লোভ এখন এতটাই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যে, তা নিয়ন্ত্রণ করা দুঃসাধ্য। মানুষের মানবিক স্বভাব বদলে গেছে, তার চরিত্রের গুণগুলো লোপ পেতে চলেছে। নেতিবাচক চিন্তা-চেতনা তাকে অহরহ লোভের দিকে, অর্থ-সম্পদ লাভের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষ হয়ে উঠেছে হিংস্র পণ্য। তাই সে নিজে অধিক লাভবান হতে অন্যের ক্ষতি করতে, অন্যের জীবননাশ করতে, অনেক তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে কোনো পরোয়া করে না। তার লক্ষ মানুষের জীবন নয়- তার লক্ষ্য প্রস্তুত অর্থ-সম্পদ অর্জন, বিলাসী জীবন-যাপনের মাধ্যমে জীবনকে উপভোগ করা। এ কারণে দ্রব্যের ওজন বৃদ্ধি করে লাভবান হওয়ার জন্য খাঁটি খাদ্যে কাঁকর-বালি ইত্যাদি মেশায়, সবজি-ফল-মাছ-মাংস তাজা রাখার জন্য মেশায় ফরমালিন, ঘোড়া দুধে মেশায় মেলামাইন। জীবন রক্ষাকারী ওষুধে মেশায় ট্যালকম পাউডার, আটা-ময়দা ও নিম্নমানের উপাদান। ঘিয়ের সঙ্গে পশুর চর্বি, নারকেল তেলের সঙ্গে বাদাম তেল, সিরকার সঙ্গে শিয়াল কাটার বীজ, চা-পাতার সঙ্গে কাঠের গুঁড়া, মরিচ ও হলুদের গুঁড়ার সঙ্গে রঞ্জক পদার্থ, কোমল পানীয়ের সঙ্গে বিষাক্ত কার্বোলিক্স মিথাইল সেলুলোজ মেশায়। এসব রাসায়নিক মেশানোর ফলে সুস্থ মানুষ পেটের পীড়া, শ্বাসকষ্ট, বদহজম, ডায়রিয়া, আলসার, চর্মরোগ, ক্যান্সার, লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হচ্ছে। দীর্ঘগতিতে এসব রাসায়নিক দ্রব্য লিভার, কিডনি, হার্ট এমনকি মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতাও হ্রাস করে একেজনে করে দেয়। এ ক্ষেত্রে শিশুরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। ভেজাল রোধে কঠোর আইন করা হয়েছে, ভ্রাম্যমাণ আদালত করা হয়েছে, নানামুখী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তারপরও লোভী মুনাফাখোর মানুষের ভেজাল-তৎপরতা কমছে না। এর জন্য নিয়মিত অভিযান পরিচালনা, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, জনসচেতনতা সৃষ্টি ও সামাজিকভাবে ভেজাল জিনিস বয়কট করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই।

সত্যবাদিতা

সব কালে সব দেশে সত্যবাদিতা নন্দিত ও প্রশংসিত। সত্যবাদিতা সত্যের শক্তিতে বলীয়ান। এ শক্তি মানুষকে সৎ, নিলোভ, ত্যাগী জীবনের দিকে পরিচালিত করে। আর মিথ্যা মানুষকে লোভ-লালসা, ভোগ ও স্বার্থপরতায় নিমজ্জিত করে। সত্যবাদী মানুষকে কেউনা মেলাই কেনা যায় না। ন্যায়, সত্য ও সুন্দরের পূজারি সত্যবাদী সব সময়ে নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান। সে বিবেকবান, নিরপেক্ষ, কর্মঠ ও পরোপকারী। সে কোনো হুমকি, জবরদস্তি, ভয়-ভীতিকে পরয় দেয় না। এমনকি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সত্য কথা বলতে বিধা করে না। নিজের জন্য যেমন, তেমনই অনের কল্যাণেও নিজের অর্থ, শ্রম, মেধা ব্যয় করতে কিছুমাত্র ভাবেন না। অথচ আমাদের সারপাশের সমাজজীবনে মিথাচার এমনভাবে ঘিরে ধরেছে যে মনে হয় সত্যবাদিতার আদর্শ ও মহিমা যেন মুহূর্তেই হাস পেয়ে যাবে। অবশ্য মাঝে মাঝে মিথ্যাচার জয়ী হলেও তা নিতান্ত সাময়িক। কেননা সত্যের মহিমায় সত্যবাদিতা চিরকালই ছিল, চিরকালই থাকবে। মানুষ মূলত সৎ ও সত্যবাদী। পরিবেশ-পরিস্থিতির চাপে পড়ে হয়তো মিথ্যাচারকে প্রশ্রয় দেয়, কিন্তু তা সব সময়ের জন্য নয়। মহৎ ও বরণীয় যাঁরা, তাঁরা সবাই ছিলেন সত্যবাদী। সত্যবাদিতাকেই তাঁরা সমাজের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস করেছেন। কারণ ব্যক্তি, সমাজ তথা জাতীয় কল্যাণ, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য সত্যবাদিতার বিকল্প নেই।

নারী শিক্ষা

বিবেশের প্রতিটি শিশু মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে চোখ খুলে দেখতে পায় মা ও মাতৃভূমির প্রতিকৃতি। বড় হয় মা ও মাটির মেহে। প্রথম শিক্ষাগ্রহণ করে মায়ের কাছ থেকে। শিক্ষিত মা মানেই শিক্ষিত সন্তান। শিক্ষিত সন্তান মানে উন্নত নাগরিক, উন্নত জাতি। তাই একটি জাতির শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে বড় হয়ে ওঠার প্রথম শর্ত শিক্ষিত মায়ের আঁচল থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা। তাছাড়া নারী ও পুরুষ মানব সমাজের ভারসাম্য ও স্থিতির সমর্থন। নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই সমাজ-সভ্যতার ক্রমবিকাশ। ফলে নারীকে পুরুষের সমান শিক্ষার সুযোগ না দিলে সে পিছিয়ে পড়বে। সভ্যতা বিকাশের গতি অনেকটা মন্থর হয়ে পড়বে। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে নারীর আসন কার্যকর করা প্রয়োজন এবং তার পূর্বশর্ত নারী শিক্ষা। উচ্চশিক্ষার ফলে নারী আজ সমাজের উন্নয়নে অর্থনীতি, রাজনীতি সর্বক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আজ নারীর ভূমিকা প্রশংসনীয়। নারী শিক্ষার প্রসার আজ সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও অত্যাবশক। নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া উচিত, সেগুলো হলো- নারীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; প্রয়োজনীয় স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা যাতে শুধু নারী/ মেয়েরা পড়ালেখা করতে পারে; নারী নির্যাতন বন্ধ করা; মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার জন্য পৃথক পরিবহন; বয়স্ক নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা; শিক্ষাব্যবস্থা অবৈতনিক ও বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা; শিক্ষাগ্রহণে নারীদের উৎসাহ দান করা; উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা। সবশেষে বলা যায়, 'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।' এ কথা মনে রেখে আমাদের স্বাধীন দেশে নারীকে শিক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে তুলতে হবে। তবেই দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব হবে।

সড়ক দুর্ঘটনা

সড়ক-মহাসড়ক এখন দুর্ঘটনার আকর আর যান্ত্রিক যানগুলো ঘাতক-দৈত্য। আমরা কেউ জানি না জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে বাইরে গিয়ে সুস্থ দেহে ফিরে আসতে পারব কি না। কেননা এখন দুর্ঘটনার বলি হচ্ছে অসংখ্য মানুষ। কেউ আহত হচ্ছে, কেউ জীবনের তরে পঙ্গু হচ্ছে, আবার কেউ হারাচ্ছে অকালে তার মূল্যবান জীবন। একটি জীবন হারিয়ে পরিবারের অনেক মানুষ মারাত্মক দর্দশার শিকার হচ্ছে, অনেক পরিবার নিঃস্ব হয়ে পথে বসেছে। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সন্তানদের লেখাপড়া, চিকিৎসা। খাওয়া-পরা জোটাতেই হিমশিম খাচ্ছে এসব পরিবারের সদস্যরা। অথচ এসব দুর্ঘটনা যারা ঘটাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে মামলা হচ্ছে, কিন্তু কোনো বিচার হচ্ছে না। এমনকি গাড়ির মালিকের পক্ষ থেকে বা সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হচ্ছে না কোনো সাহায্য সহযোগিতা। ফলে অধিক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে দুর্ঘটনা কবলিতের পরিবার-পরিজন। প্রতিবছর বাংলাদেশে অন্তত দশ হাজার দুর্ঘটনা ঘটে আর এসব দুর্ঘটনায় অন্তত পাঁচ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে। আহত হয় কমপক্ষে দশ হাজার মানুষ। সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতি হয় প্রায় এক হাজার কোটি টাকার সম্পদ। অনুন্নত সড়ক, অদক্ষ চালক, ক্রটিপূর্ণ যানবাহন, ক্রটিপূর্ণ ট্রাফিক ব্যবস্থা, নানামুখী দুর্নীতি, জনগণের অসচেতনতা এসব দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। দুর্ঘটনা হ্রাস করার জন্য সড়কগুলোর উন্নয়ন, বাইপাস সড়ক নির্মাণ, ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন, চালকদের প্রশিক্ষণ ও মটিভেশন, দুর্নীতিরোধ, ক্রটিপূর্ণ গাড়ি চলাচল নিষিদ্ধকরণ, আইন যুগোপযোগীকরণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি অত্যাবশক।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য একটি অনিবার্য বিষয়। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সর্বাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে এদেশের নিরীহ ঘুমন্ত মানুষের ওপর অতর্কিত আক্রমণ শুরু করলে ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণায় উজ্জীবিত হয়ে এদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক, শিল্পী-সাহিত্যিক, যুবকসহ নানা পেশার মানুষের সাথে বাঙালি সেনা, ইপিআর, পুলিশ, আনসারের সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। এদেশের সর্বস্তরের মানুষ নানাভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য-সহযোগিতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসে। পাকিস্তানি সেনা ও তাদের এদেশীয় দোসরদের অত্যাচার-নির্যাতন, নির্বিচার হত্যা ও ধংসযজ্ঞের কারণে এক কোটি মানুষ শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নেয়। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণসহ নানাভাবে ভারত আমাদের সাহায্য-সহযোগিতা করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক, মানবাধিকার নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিকসহ সচেতন মানুষ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সহায়তা করেন। মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন সেক্টরে গেরিলা ও সম্মুখযুদ্ধে হানাদারদের হত্যা ও পরাজিত করতে থাকে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে যৌথবাহিনীর প্রবল আক্রমণের মুখে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পরাজিত হয়ে পালাতে থাকে ঢাকার দিকে। অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ৯৩ হাজার সেনা যৌথবাহিনীর কাছে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয় এবং আত্মসমর্পণ করে। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে জন্ম নেয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সম্যকভাবে জানা অবশ্যই কর্তব্য।

মাতার কাছে পুত্রের চিঠি

২ সেপ্টেম্বর ২০১৯
মতিঝিল, ঢাকা
শ্রদ্ধেয় মা,

আমার সালাম নিও। আশা করি ভালো আছো।
আমি নিরাপদে ছাত্রাবাসে পৌঁছেছি। যদিও আসার পথে বাড়ির কথা ভেবে আমার মন খারাপ লাগছিল। প্রতিবারই বাড়ি থেকে আসার সময়ে আমার এরকম হয়। এসেই জানতে পারলাম আগামী ১০ই নভেম্বর থেকে আমাদের প্রাক-নির্বাচনি পরীক্ষা শুরু হবে। তাই পড়াশোনা নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। আমার জন্য দেওয়া কেরো। ছুটিতে বাড়ি গিয়ে লেখাপড়ায় খানিকটা ক্ষতি হয়েছিল। তাই এখন বেশি পরিশ্রম করে লেখাপড়ার সামগ্রিক ক্ষতি পুষিয়ে নিচ্ছি। মা, আমি তোমাকে আমার জীবনের লক্ষ্যের কথা জানিয়েছি। আমি সেই লক্ষ্য পূরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করব, তোমাদের মুখ উজ্জ্বল করার চেষ্টা করব। আসার সময়ে মেহরাবেকে কিছুটা অসুস্থ দেখে এসেছি। এখন ও কেমন আছে, জানিয়ো। বাবাকে শরীরের প্রতি যত্ন নিতে বলো। আমার জন্য চিন্তা কেরো না। আমি এখন ভালো আছি।
ইতি
তোমার মেহের
মাহের
ডাকে পাঠানোর জন্য খাম:
প্রেরক: মাহের আবদুল্লাহ, ২৪ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
প্রাপক: ফারজানা রাহমান, প্রযত্নে: আবদুল্লাহ আল মামুন, গ্রাম: কামরানির চর, ডাকঘর: পাঁচগাও, উপজেলা: আড়াইহাজার, জেলা: নারায়ণগঞ্জ

কন্যার কাছে পিতার চিঠি

২৩ নভেম্বর ২০১৯
তেজগাঁও, ঢাকা
মেহের প্রাপ্তি,

আমার আশীর্বাদ নিয়ো। আশা করি ভালো আছো।
গত চিঠিতে তোমার প্রাক-নির্বাচনি পরীক্ষার ফলাফল জেনেছি। প্রায় সবগুলো বিষয়ে ভালো করেছ। গণিতে খানিকটা কম নম্বর পেয়েছ। এতে ঘাবড়ে যাবার কিছু নেই। গণিতের কোন বিষয়গুলো বুঝতে এখনও সমস্যা হচ্ছে, তা আগে শনাক্ত করো। প্রয়োজনে তোমার ক্লাসের গণিত শিক্ষকের সহযোগিতা নাও। মুখস্থ না করে বুঝে পড়ার চেষ্টা কোরো। সামনে তোমার নির্বাচনী পরীক্ষা এবং এসএসসি পরীক্ষারও খুব বেশি দেরি নেই। তাই এই সময়টা খুব ভালোভাবে কাজে লাগাতে হবে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে ইতিবাচকভাবে কাজে লাগাতে হবে। পরীক্ষা শিক্ষাজীবনের একটি অংশ। তাই পরীক্ষাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এই সময়ে কীভাবে সুস্থ থেকে নিয়মানুযায়ী পড়াশোনা করা যায়, সেদিকে খেয়াল রেখো। বেশি রাত জেগো না, যথাসময়ে খাবার খেয়ো। আমরা বাসার সবাই ভালো আছি।
ইতি
তোমার বাব
অনিরুদ্ধ রায়
ই-মেইলে পাঠানোর জন্য ঠিকানা ও বিষয়:
প্রেরক: aniruddharay@gmail.com
প্রতি: praptiray@gmail.com
বিষয়: উপদেশ

ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা জানিয়ে বন্ধুকে চিঠি

৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
সোবহানবাগ, ঢাকা
প্রিয় মিতি,

আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করিস। অনেকদিন হলো তোর কোনো চিঠি পাচ্ছি না। ক্যাডেট কলেজের বন্ধুদের পেয়ে আমার কথা কি ভুলে গেছিস? আজ তোকে লিখতে বসেছি এক ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা জানাতে। গত মাঘী পূর্ণিমার ছুটিতে আমি আর সীমান্ত গিয়েছিলাম ঐতিহাসিক স্থাপত্য নিদর্শন লালবাগ কেল্লা দেখতে। ইতিহাসের বইয়ে শায়েস্তা খাঁর কথা পড়েছি। সেই শায়েস্তা খাঁর আমলে নির্মিত ঢাকার প্রায় চারশো বছরের পুরানো স্থাপনা এই লালবাগ কেল্লা। এর প্রাকৃতিক শোভা, প্রাচীন স্থাপত্য-সৌন্দর্যের কথা চিঠিতে লিখে পুরোপুরি তোকে বোঝাতে পারব না।
আমরা সেদিন সকালেই লালবাগের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলাম। পুরান ঢাকার লালবাগে এর অবস্থান। দর্শনার্থীদের জন্য ঢোকার প্রবেশ পথে টিকিট কাউন্টার। সেখানে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটলাম। ভিতরে প্রবেশ করার পর কয়েকজন বিদেশি দর্শনার্থীদের দেখলাম। ফটকের ভিতরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল এক নয়নাভিরাম সৌন্দর্য। মুঘল স্থাপত্য, মসজিদ, ভলুণ্ট মাঠ, সুসজ্জিত ফুলের বাগান দেখে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছিল। লালবাগ কেল্লার নির্মাণ কাজ শুরু ১৬৭৮ সালে। তৎকালীন মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র সুবেদার আজম শাহ এই কেল্লার নির্মাণ কাজ শুরু করেন। সুবেদার শায়েস্তা খাঁর আমলে এর মূল নির্মাণ সম্পন্ন হয়। লালবাগ কেল্লা মোঘল আমলের ঐতিহাসিক নিদর্শন। এটি তৈরিতে একই সাথে ব্যবহার করা হয়েছে কষ্টি পাথর, মার্বেল পাথর এবং রং-বেরঙের টাইল। লালবাগ কেল্লার তিনটি বিশাল দরজার মধ্যে যে দরজাটি বর্তমানে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া আছে, সেই দরজা দিয়ে ঢুকলে বরাবর সোজা চোখে পড়ে পরি বিবির সমাধি। পরি বিবি ছিলেন শায়েস্তা খাঁর অকালপ্রয়াত কন্যা। কেল্লার চত্বরে আরো রয়েছে কেন্দ্রস্থলের দরবার হল ও হাম্মামখানা, উত্তর-পশ্চিমাংশের তিন গম্বুজ বিশিষ্ট শাহি মসজিদ ও একটি জাদুঘর। দর্শনার্থীদের জন্য বসার জায়গা আছে। স্থাপনাগুলো ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে এখনো দাঁড়িয়ে আছে।
আমাদের খুব ভালো লেগেছে। সময় পেলে তুইও একবার দেখে আসিস বাংলার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লালবাগ কেল্লা। ভালো থাকিস।
ইতি
তোর বন্ধু দীপ
ডাকে পাঠানোর জন্য খাম:

প্রেরক
দীপ সরকার
১৯ সরকারি অফিসার্স কোয়ার্টার
সোবহানবাগ
ঢাকা

প্রাপক
মতিউর রহমান
নজরুল হাউস, কক্ষ নম্বর: ৩০
গ্রাম: কামরানির চর, ডাকঘর: পাঁচগাঁও
মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ
ডাকঘর: মির্জাপুর
টাঙ্গাইল

লেখকের কাছে পাঠকের চিঠি

২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
মিরাবাজার, সিলেট

জনাব আহমদ সাদি,
আমার শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। আমি আপনার পূর্বপরিচিত নই। আমি আপনার বইয়ের একজন পাঠক। এবারের একুশের বইমেলায় প্রকাশিত আপনার 'বাংলাদেশের প্রান্তিক-উৎসব' বইটি আমি পড়েছি। বইটি বইমেলা থেকেই সংগ্রহ করেছি। প্রতাশা ছিল আপনার সঙ্গে দেখা হবে, আপনার স্বাক্ষর সংবলিত বইটি পাব। কিন্তু সেদিন আপনি স্টলে আসেননি। আমাকেও পরদিন সিলেটে ফিরতে হয়েছে।
'বাংলাদেশের প্রান্তিক-উৎসব' বইটি পড়ে আমি খুব উপকৃত হয়েছি। মূলধারার উৎসবের পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রান্তিক অঞ্চলে যে কত উৎসব আছে, তা আপনার বই পড়ার আগে জানতে পারিনি। আপনি একজন নিষ্ঠাবান গবেষক হিসেবে অনেক আগে থেকেই পরিচিত। এই বই রচনায় আপনার সেই যোগ্যতার যথাযথ প্রতিফলন ঘটেছে। আমি বেশি খুশি হয়েছি এই জন্য যে, সিলেট অঞ্চলের মণিপুরি, খাসিয়া ও চা শ্রমিকদের উৎসবের কথা আপনার বইয়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। বইটির ভাষা ও অধ্যায়-বিভাজন আমার কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। ৩১২ পৃষ্ঠার বইটি আমি দুই দিনে পড়ে শেষ করেছি।
আপনার সঙ্গে দেখা করার প্রতাশা রইল। যদি কখনও সিলেটে আসেন, আমাকে জানালে ও আমাদের বাসায় আতিথ্য গ্রহণ করলে খুশি হব। আপনার জন্য শুভ কামনা।
ইতি
আতিকুল ইসলাম
ই-মেইলে পাঠানোর জন্য ঠিকানা ও বিষয়:
প্রেরক: atikulislam@gmail.com
প্রতি: ahmadsadik@gmail.com
বিষয়: শুভেচ্ছা বার্তা

আমন্ত্রণপত্র

সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানোর পত্রকে আমন্ত্রণপত্র বলে। বিভিন্ন জাতীয় দিবস, জন্মবার্ষিকী, বিবাহ, মৃত্যুবার্ষিকী, সাহিত্যসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বইমেলা, নাগরিক সংবর্ধনা, নাট-উৎসব, লোক-উৎসব ইত্যাদি উপলক্ষে আমন্ত্রণপত্র রচনা করা হয়। আমন্ত্রণপত্র সাধারণত মুদ্রিত হয়। অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট তারিখের কিছুদিন পূর্বে আমন্ত্রিতদের মধ্যে আমন্ত্রণপত্র বিতরণ করা হয়। অনেক সময়ে আমন্ত্রণপত্রের উপরের দিকে অনুষ্ঠানের শিরোনাম লেখা থাকতে পারে। এখানে দুটি আমন্ত্রণপত্রের নমুনা উল্লেখ করা হলো।

রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্যাপন উপলক্ষে আমন্ত্রণপত্র

রবীন্দ্র জয়ন্তী ১৪২৮

সুধী,
আগামী ২৫শে বৈশাখ ১৪২৮, শনিবার, ৮ই মে ২০২১, সকাল ১০টায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জামালপুর জিলা স্কুলের সাংস্কৃতিক পরিষদের উদ্যোগে স্কুল-মিলনায়তনে একটি আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন জামালপুর জেলার মাননীয় জেলা প্রশাসক জনাব আখতার জামান। 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন' বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন সরকারি বিনোদ বিহারী কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ড. আযাজ মাহমুদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব আউয়াল ফয়সাল।
অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি আন্তরিকভাবে কামনা করি।

মুশফিক রোহান,
সাংস্কৃতিক সম্পাদক,
জামালপুর জিলা স্কুল ছাত্রসংসদ

অনুষ্ঠানসূচি
১০:০০ : অতিথিদের আসন গ্রহণ
১০:০৫ : 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ
১০:৩০ : প্রধান অতিথির ভাষণ
১০:৪৫ : সভাপতির ভাষণ
১১:০০ : সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান: সংগীত-নৃত্য-আবৃত্তি
১১:৩০ : নাটক 'চিরকুমার সভা'
১২:০০ : অনুষ্ঠানের সমাপ্তি

নাগরিক সংবর্ধনা উপলক্ষে আমন্ত্রণপত্র

সুধী,
আগামী ১৯শে মার্চ ২০২১ শুক্রবার বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে কুমিল্লা টাউন হল মিলনায়তনে অধ্যাপক-গবেষক নুরুল আলমের ৭৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে একটি নাগরিক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আকতার হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন কথাসাহিত্যিক নোমান রায়হান।
অনুষ্ঠানে আপনার সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করছি।

বিপুল বর্মণ,
আহ্বায়ক,
নুরুল আলম সংবর্ধনা পরিষদ

অনুষ্ঠানসূচি
৪:৩০ : অতিথিদের আসন গ্রহণ
৪:৩৫ : সূচনা সংগীত
৪:৫০ : স্বাগত বক্তব্য
৫:০০ : সংবর্ধনা গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন
৫:১০ : উত্তরীয় পরিধান ও ক্রেস্ট প্রদান
৫:১৫ : বিশেষ অতিথিদের শুভেচ্ছা বক্তব্য
৫:৪৫ : প্রধান অতিথির বক্তব্য
৫:৫৫ : অধ্যাপক নুরুল আলমের প্রতিক্রিয়া
৬:১০ : সভাপতির বক্তব্য
৬:৩০ : সমাপ্তি ঘোষণা

---

১. স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দুর্দশার কথা জানিয়ে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য চিঠি

৩ জুন ২০২১
সম্পাদক
দৈনিক সমকাল
১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২১৫
বিষয়: 'চিঠিপত্র' কলামে প্রকাশের জন্য পত্র।
মেহাদয়
আপনার বহুল প্রচারিত দৈনিকে সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাই।
বিনীত,
জান্নাতুল মাওয়া
জুলগাঁও, শ্রীবর্দী, শেরপুর।

জুলগাঁও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দিকে নজর দিন
শেরপুর জেলার শ্রীবর্দী উপজেলার জুলগাঁও একটি সীমান্তবর্তী গ্রাম। দুই দশক আগে কমিউনিটি স্বাস্থ্যপ্রকল্পের আওতায় পাহাড়-টিলা-বন পরিবেষ্টিত দুর্গম এ-অঞ্চলের সাধারণ মানুষের চিকিৎসাসেবা দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। আশেপাশের ছয়টি গ্রামের দশ হাজার মানুষ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করে। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে এখানকার চিকিৎসাব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য অন্তত পাঁচ জন চিকিৎসক থাকার কথা, আছেন তিন জন। তাঁরাও নিয়মিত আসেন না। ভবনটিও সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। নিয়মিত ওষুধের সরবরাহ নেই। সাধারণ মানুষ যথাযথ চিকিৎসা না পেয়েই ফিরে যাচ্ছে। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা হয়তো জেলাশহরে বা ঢাকায় গিয়ে চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্যসেবা পেতে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। এলাকাবাসীর দাবি, এই করুণ অবস্থা থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে রক্ষা করা হোক। স্বাস্থ্যসেবা মানুষের মৌলিক অধিকার। যথাযথ কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে জুলগাঁও স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির নিয়মিত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জুলগাঁও গ্রামের সাধারণ মানুষ প্রত্যাশা করে।
জান্নাতুল মাওয়া,
জুলগাঁও, শেরপুর।

---

২. সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিকারের দাবি জানিয়ে পত্রিকায় প্রকাশের উপযোগী চিঠি

২৫ এপ্রিল ২০১৯
সম্পাদক,
দৈনিক প্রথম আলো
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫
বিষয়: 'চিঠিপত্র' কলামে প্রকাশের জন্য পত্র।
মেহাদয়
আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় প্রকাশের জন্য সড়ক-দুর্ঘটনার প্রতিকার সংক্রান্ত একটি পত্র এইসঙ্গে যুক্ত করা হলো। পত্রটি ছাপা হলে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে।
বিনীত,
লিটন রোজারিও
নীলেক্ষত, ঢাকা।

সড়ক দুর্ঘটনার অবসান চাই
আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রধান সমস্যা ও আতঙ্কের নাম সড়ক দুর্ঘটনা। প্রায়ই টেলিভিশনের পর্দায় ও পত্রিকার পাতায় চোখে পড়ে সড়ক দুর্ঘটনার মর্মান্তিক খবর। সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতিদিন অনেক মানুষ আহত ও নিহত হচ্ছে। একটি পত্রিকার তথ্য মতে, ২০২০ সালে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার সড়ক দুর্ঘটনায় সাত হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। মৃত্যুর মিছিল যেন থামছে না। আহত অনেকে দুর্বিষহ জীবন যাপন করছে। এই ধরনের মৃত্যু কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এটি এখন জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। এর প্রতিকার জরুরি। প্রতিটি মানুষের প্রাণ মহামূল্যবান। তাই আমরা চাই না, সড়ক দুর্ঘটনায় আর একটি প্রাণও ঝরে পড়ুক। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে বাস্তব ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। আমাদের দেশে সাধারণত কয়েকটি কারণে সড়ক দুর্ঘটনা হয়ে থাকে; যেমন — অনুপযোগী রাস্তা, ত্রুটিযুক্ত গাড়ি, অদক্ষ চালক, ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত পণ্য পরিবহন, ওভারটেকিং, ট্রাফিক আইন অমান্য করা ইত্যাদি। পথচারীদের ফুটপাত, জেব্রা ক্রসিং, ফুটওভার ব্রিজ ব্যবহার না করার ফলেও অনেক সময়ে দুর্ঘটনা ঘটে। সমস্যা যেহেতু চিহ্নিত, সেহেতু এর থেকে মুক্তির পথ বের করা আমাদের জন্য মোটেই কঠিন হবে না। রাস্তাঘাটকে নিয়মিত সংস্কার করার পাশাপাশি প্রয়োজনে কঠোর আইন প্রয়োগ করতে হবে। আমরা আশা করি, সমস্যা দূর করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
লিটন রোজারিও,
নীলেক্ষত, ঢাকা।

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় উপলক্ষে মানপত্র

বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের
২০২১ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় উপলক্ষে
মানপত্র

হে বিদায়ী অগ্রজবৃন্দ,

যে পথ একদিন তোমাদের নিয়ে এসেছিল এই বিদ্যালয়ের সবুজ আঙিনায়, আজ সেই পথই আবার তোমাদের ডাক দিয়েছে। 'কে আছ জোয়ান, হও আগ্রয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যত!' হৃদয়-বীণায় তাই আজ বাজছে বিদায়ের করুণ সুর। শুভ হোক তোমাদের ভবিষ্যতের পথচলা। তোমরা আমাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা গ্রহণ করো।
হে অগ্রজ সতীর্থবৃন্দ

এই বিদ্যালয়ে তোমাদের কেটেছে স্মৃতিময়, প্রীতিময় অনেক দিন। তোমাদের পদাঞ্চল পদভারে এই বিদ্যালয়ের আঙিনা ছিল মুখরিত। তোমাদের সাহচর্যে আমরাও নানাভাবে উপকৃত হয়েছি, সমৃদ্ধ হয়েছি। তোমাদের সঙ্গে আমাদের স্নেহসিক্ত প্রীতিময় বন্ধন যেন অটুট থাকে আজীবন। এই বিদায় আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। একবার এই বিদ্যাময়ীর মেহতেলে আশ্রয় নিলে তিনি কখনও কাউকে মন থেকে বিদায় দেন না। তোমরা শিক্ষাজীবনের এক স্তর থেকে আরেক স্তরে উন্নীত হতে যাচ্ছ, যে জন্য তোমাদের অভিনন্দন। আসন্ন এসএসসি পরীক্ষায় তোমাদের সাফল্য কামনা করি।
হে অগ্রপথিকবৃন্দ,

নবজীবনের আহ্বানে, আলোকিত জীবনের সন্ধানে তোমরা এগিয়ে যাচ্ছ নবদিগন্তের দিকে। লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই বাংলাদেশের দুঃখ, দারিদ্র ও অন্ধকার ঘুচিয়ে তোমরা গড়ে তুলবে সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ - এ আমাদের প্রত্যাশা। তোমরাই আনবে সোনালি উষার আলোকিত দিন।
তোমাদের নতুন অভিযাত্রা সফল হোক।

তারিখ: ২৩ জানুয়ারি ২০২১
তোমাদের প্রীতিধন্য অনুজবৃন্দ,
বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

খ্যাতিমান কবি বা সাহিত্যিকের আগমন উপলক্ষে অভিনন্দনপত্র

রাজশাহী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে
নন্দিত কথাসাহিত্যিক জনাব আহমেদের আগমনে
শ্রদ্ধার্ঘ্য

হে বরেণ্য অতিথি,

বরেন্দ্রভূমি নামে খ্যাত রাজশাহী আজ আপনার পদধূলিতে ধন্য। রবীন্দ্র-শুতিধন্য এই অঞ্চলের ঐতিহাবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আপনার আগমনে আমরা আনন্দিত ও গৌরবান্বিত। আপনার সাহচর্য পেয়ে আমরা উৎসাহিত ও উজ্জীবিত। আপনি আমাদের প্রাণঢালা শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণ করুন।
হে নন্দিত কথাশিল্পী,

বাংলাদেশের সমকালীন কথাসাহিত্যে আপনার অবদান অনন্য। নিম্নবিত্ত মানুষ ও মধ্যবিত্ত জীবন রূপায়ণে আপনার শৈল্পিক দক্ষতা বিস্ময়কর ও চুড়াপশী। কথাশিল্পী হিসেবে আপনার উন্নত জীবনবোধ, শৈল্পিক চেতনা পাঠকদের মুগ্ধ করে। বর্তমান প্রজন্মের কাছে আপনার রয়েছে বিপুল জনপ্রিয়তা। আজ আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়ে আমরা মুগ্ধ ও অভিভূত।
হে ভবিষ্যতের দিশারি,

আপনার লেখা আমাদের নতুন পথের দিশারী। নতুন প্রজন্মকে আলোকিত মানুষ করে তুলতে আপনার লেখনী কাজ করে চলেছে নীরবে, নিভৃতে। আমাদের বিদ্যালয়ে আপনার আগমন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকুক। আপনি দীর্ঘজীবী হোন। বাংলাদেশের সাহিত্যের আকাশে আপনার সাহিত্যকর্ম চির-উজ্জ্বল সুধার মেতো আলো ছড়াক। এই আমাদের একান্ত কামনা।

তারিখ: ১২ ডিসেম্বর ২০২১
শ্রদ্ধাসহ,
আপনার গুণমুগ্ধ শিক্ষার্থীবৃন্দ,
রাজশাহী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী

সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের আবেদন

১০ অক্টোবর ২০২১
প্রধান শিক্ষক
কুলকান্দি শামসুন্নাহার উচ্চ বিদ্যালয়
কুলকান্দি, ইসলামপুর
জামালপুর
বিষয়: বাংলা বিষয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের আবেদন।
মেহোদয়,
সবিনয় নিবেদন এই যে, গত ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানতে পারলাম, আপনার বিদ্যালয়ে বাংলা বিষয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহবান করা হয়েছে। আমি উক্ত পদের একজন প্রার্থী। আমার ব্যক্তিগত তথ্য ও শিক্ষাগত যোগ্যতা নিম্নরূপ।

১. নাম : রেখা আক্তার
২. মাতার নাম : খোদেজা বেগম
৩. পিতার নাম : একরামুল হক
৪. বর্তমান ঠিকানা : ৩৩ পশ্চিম নয়াপাড়া, জামালপুর সদর উপজেলা, জেলা: জামালপুর
৫. স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: হরিণধরা, ডাকঘর: কুলকান্দি, ইউনিয়ন: কুলকান্দি, উপজেলা: ইসলামপুর, জেলা: জামালপুর
৬. জন্ম তারিখ : ২৫ জুন ১৯৯৪
৭. জাতীয়তা : বাংলাদেশি
৮. ধর্ম : ইসলাম
৯. শিক্ষাগত যোগ্যতা :

পরীক্ষা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়	পাশের বছর	বিভাগ	ফলাফল
এসএসসি	শহিদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়	ঢাকা	২০১১	মানবিক	জিপিএ ৪.০০
এইচএসসি	ইসলামপুর ডিগ্রি কলেজ	ঢাকা	২০১৩	মানবিক	জিপিএ ৪.৫০
বিএ (সম্মান)	জাহেদা শফির মহিলা কলেজ	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	২০১৭	বাংলা	সিজিপিএ ৩.০০

আমার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি।
নিবেদক
(স্বাক্ষর)
রেখা আক্তার
৩৩ পশ্চিম নয়াপাড়া
জামালপুর সদর উপজেলা
জেলা: জামালপুর
সংযুক্তি:
ক. সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের অনুলিপি
খ. জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি
গ. দুই কপি ছবি
ঘ. তিনশো টাকার পে-অর্ডার

KRITITO

ডাকযোগে পুস্তক পাঠানোর আবেদন

৭ জানুয়ারি ২০২১
বিক্রয় কর্মকর্তা
অজন্তা প্রকাশনী
বাংলাবাজার, ঢাকা ১০০০
বিষয়: ভিপি হিসেবে ডাকযোগে পুস্তক পাঠানোর আবেদন।
প্রিয় মহোদয়,
আপনাদের প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত নিচের তালিকাভুক্ত বইগুলোর একটি করে কপি নিচের ঠিকানায় পাঠানোর জন্য অনুরোধ করছি। ভিপি হিসেবে ডাকযোগে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হলে বইগুলো গ্রহণের সময়ে আমি যাবতীয় অর্থ পরিশোধ করতে পারব। এ ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য আপনাকে অগ্রিম ধন্যবাদ জানাই।
আপনার বিশ্বস্ত
(স্বাক্ষর)
মকবুল হোসেন
৪৮ পাঁচুড়িয়া, গোপালগঞ্জ
বইয়ের তালিকা:
১. ইকবাল সিরাজ, প্রাচীন বাংলার ইতিহাস
২. নাজমুল হক, সঠিক নিয়মে লেখাপড়া
৩. মাহফুজা আক্তার, ঘুরে এলাম বাগেরহাট

ব্যাংক ঋণের জন্য আবেদন

৩০ আগস্ট ২০২১
ব্যবস্থাপক
সোনালী ব্যাংক লি.
কালীগঞ্জ শাখা, ঝিনাইদহ
বিষয়: ব্যবসায়িক ঋণ গ্রহণের জন্য আবেদন।
প্রিয় মহোদয়,
আপনার ব্যাংকে আমাদের সঞ্চয়ী ও চলতি উভয় প্রকার হিসাব খোলা আছে। আপনি হয়তো অবগত যে, আমাদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান মেসার্স জননী ট্রেডার্স দীর্ঘদিন ধরে আপনাদের ব্যাংকের সুনামের সাথে লেনদেন পরিচালনা করে আসছে। সম্প্রতি আমরা আমাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য একটি নতুন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এ লক্ষ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠানের নামে আনুমানিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যবসায়িক ঋণ গ্রহণ করা প্রয়োজন। উক্ত ঋণের মূলধন এবং সুদের অর্থ আমরা মোট ৩৬ কিস্তিতে ৩ বছরে পরিশোধ করতে চাই। ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা আপনাদের ব্যাংকের সকল শর্ত মেনে চলব। উল্লেখ্য যে, ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে আমরা আপনাদের ব্যাংক থেকে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা ঋণ নিই এবং তা যথাসময়ে পরিশোধ করি।
আমাদের চাহিদা মাফিক ঋণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি।
আপনার বিশ্বস্ত
(স্বাক্ষর)
অনীক রহমান
স্বত্বাধিকারী, মেসার্স জননী ট্রেডার্স
কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ
সোনালী ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাব নং: ১১৭৭১৮
চলতি হিসাব নং: ১২৫২০১
সংযুক্তি:
১. ব্যবসা সম্প্রসারণের কর্মপরিকল্পনা
২. পূর্বের ঋণ পরিশোধের প্রমাণপত্র

এলাকার সড়কের দুরবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ প্রতিবেদন

সড়কের বেহাল দশা: যাত্রীদের দুর্ভোগ

হাসিবুল আলম, চাটখিল (নোয়াখালী), ২২ জুলাই ২০২১॥ নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি উপজেলার জয়াগ বাজার থেকে কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ উপজেলার হাসনাবাদ পর্যন্ত শিঘ্রই মুক্তিযোদ্ধা একরামুল হক সড়কটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। প্রায় এক যুগ ধরে সড়কটির কোনো সংস্কার কাজ হয়নি। সড়কের এ বেহাল দশায় যাত্রীরা চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছে।
গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সরেজমিনে দেখা গেছে, বারো কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কটির পুরোটাই বড়ো বড়ো গর্ত ও খানাখন্দে ভরা। জয়াগ বাজার থেকে মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের নগরপাড়া সেতু পর্যন্ত দুই কিলোমিটার অংশে দুই পাশের মাটি সরে গেছে। প্রতিদিন এ সড়ক দিয়ে নোয়াখালীর চাটখিল ও সোনাইমুড়ি, কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ ও লাকসাম এবং চাঁদপুরের শহরতি উপজেলার হাজার হাজার বাসিন্দা চলাচল করে। এছাড়া কমপক্ষে ত্রিশটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এ পথে যাতায়াত করে থাকে। এলাকাবাসী জানান, সড়কটির তিন কিলোমিটার সোনাইমুড়ি এবং বাকি নয় কিলোমিটার চাটখিল উপজেলায় পড়েছে। বিগত ২০১৯ সালের বন্যায় সড়কটির সুরকির স্তর ডেবে গিয়ে বালু বের হয়ে আসে এবং সৃষ্টি হয় খানাখন্দের। এরপর প্রতি বছর বৃষ্টিপাতে পানি ও কাদায় সড়কটি একাকার হয়ে যায়, যা এখন চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। গত বুধবার একটি পিকআপ ভ্যান ভাদ্রকোল গ্রামের কাছে রাস্তার গর্তে পড়ে যায়, এতে চালকসহ তিন জন যাত্রী আহত হন। চাটখিল ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ মানুষ মরে কষ্ট, সড়কটি নিয়ে এলাকাবাসীর দুর্ভোগ দীর্ঘদিনের। অথচ এর সমাধানে কর্তৃপক্ষের কোনো নজর নেই। এই মেরামতের জন্য স্থানীয় লোকজন সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে একাধিকবার আবেদন করলেও কোনো প্রতিকার পাননি। এলাকাবাসীর দাবি, গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কটি দ্রুত সংস্কার করে জনদুর্ভোগ কমাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যেন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

প্রতিবেদকের নাম: হাসিবুল
প্রতিবেদনের শিরোনাম: সড়কের বেহাল দশা: যাত্রীদের দুর্ভোগ
প্রতিবেদনের স্থান: নোয়াখালি
প্রতিবেদনের সময়: রাত ১০টা

বিদ্যালয়ের নবীনবরণ ও বিদার-সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সম্পর্কে সংবাদ প্রতিবেদন

বালুটিলা উচ্চ বিদ্যালয়ে নবীনবরণ ও বিদার-সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

মনিষা তঞ্চঙ্গ্যা, বান্দরবান, ২৯ জানুয়ারি ২০২১॥ বান্দরবান জেলার থানচি উপজেলার বালুটিলা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গত ২৮শে জানুয়ারি ২০২১ রবিবার বিদ্যালয়ের নবীন শিক্ষার্থীদের জন্য নবীনবরণ এবং এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য বিদায়-সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বালুটিলা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি উদয় কুমার চাকমা। তিনি বলেন, এই এলাকার ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য বিদ্যালয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। নবীন শিক্ষার্থীদের তিনি মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করার আহ্বান জানান এবং ২০২১ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের সফলতা কামনা করেন। এ বছর বিদ্যালয়টির মানবিক শাখা থেকে পঞ্চাশ জন, বিজ্ঞান শাখা থেকে চল্লিশ জন এবং ব্যবসায় শিক্ষা শাখা থেকে পঁচিশ জনসহ সর্বমোট একশ পনেরো জন পরীক্ষার্থী আগামী ২রা ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাওয়া এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। বালুটিলা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অজয় ত্রিপুরা এই নবীনবরণ ও বিদায়-সংবর্ধনা সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্য বক্তিদের মধ্যে বক্তৃতা করেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী ললিত সরকার, বালুটিলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুহিতুল আলম প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে অনেক শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষার্থীদের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে এ দিনের সাড়ম্বর আয়োজন সমাপ্ত হয়।

বিদ্যালয়ে 'শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদযাপন সম্পর্কিত সংবাদ প্রতিবেদন

রূপনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 'মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদযাপিত

জেবেদ হোসেন, মিরপুর, ঢাকা, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১॥ 'মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উপলক্ষে রূপনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গতকাল ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২১ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা প্রভাতফেরির মাধ্যমে শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ সময়ে সবার কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে একুশের গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি'। ভাষা-শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পর শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে আবৃত্তি ও সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিক্ষার্থীরা বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কবিদের নির্বাচিত কবিতা আবৃত্তি করে। আবৃত্তি শেষে দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করে বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক দল। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল আলোচনা-সভা। 'মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'-এর উপরে আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক আবেদুর রহমান। তিনি বলেন, 'মহান ভাষা আন্দোলনের চেতনা বাঙালি জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল স্বাধিকার আন্দোলনে। বর্তমান প্রজন্মের কাছে তা প্রেরণার উৎস।' এরপর আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আজিজুর রহমান।

বৃক্ষরোপণ বিষয়ক সংবাদ প্রতিবেদন

রৌমারীতে বৃক্ষরোপণ উৎসব

পিয়াস বাড়ৈ, রৌমারী, কুড়িগ্রাম, ২২ জুলাই ২০২১॥ রৌমারী উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গতকাল ২১শে জুলাই বুধবার রৌমারী উচ্চ বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ উৎসব পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে রৌমারী উচ্চ বিদ্যালয়সহ উপজেলার দশটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় পাঁচ শত শিক্ষার্থীর প্রত্যেকের মধ্যে একটি ফলদ ও একটি বনজ বৃক্ষের চারা বিতরণ করা হয়। এর আগে রৌমারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন রৌমারী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ আমীন। এ সময়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী বক্তৃতায় মোহাম্মদ আমীন পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণের গুরুত্বে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতন হতে বলেন। প্রতি বছর প্রত্যেকের বাড়ির ফাঁকা জায়গায় অন্তত দুইটি গাছের চারা রোপণের পরামর্শ দেন। এরপর বিদ্যালয়ের খেলার মাঠের উত্তর প্রান্তে একশো মেহগনি, শিশু ও সেগুন গাছের চারা রোপণ করা হয়।

চারুকলার সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক, ঢাকা, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের উদ্যোগে সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। রাজধানীর ঢাকার বিভিন্ন স্কুল-কলেজের প্রায় ৩৫০ জন শিক্ষার্থী এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করে। সকাল নয়টায় অনুষদ প্রাঙ্গণের বকুলতলায় প্রতিযোগিতা শুরু হয়। নির্দিষ্ট রচনা থেকে লেখার জন্য শিক্ষার্থীদের এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়। দুটি বিভাগে ছিল এ আয়োজন বাংলা ও ইংরেজি। বিকালে ছিল পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রতি বিভাগে তিন জন করে মোট ছয় জনকে পুরস্কৃত করা হয়। বিচারক হিসেবে ছিলেন এই চারুকলা অনুষদের শিক্ষক অধ্যাপক মুকুল কুমার মিত্র, ড. আয়াশা সুলতানা ও ড. আফজান হোসেন খান। জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন সংস্কৃতিকর্মী জনাব ফজলুল হক। এরপর চারুকলা অনুষদের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক পর্ব উপভোগ করেন উপস্থিত দর্শক ও অতিথিবৃন্দ।

বিদ্যালয়ে 'শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদযাপন-সম্পর্কিত সংবাদ প্রতিবেদন

রংপুর জিলা স্কুলে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত

মৌসুমি মৌ, রংপুর, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫। গতকাল ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ রংপুর জিলা স্কুলে যথাযোগ্য মর্যাদায় 'শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে সেখানে নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

রাত ১২টা ০১ মিনিটে শহরের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে অনুষ্ঠানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। নিজেদের স্কুল প্রাঙ্গণে তাদের অনুষ্ঠান শুরু হয় ভোর ছয়টায়। এ সময় নয়শতাধিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত প্রভাতফেরির শুলনাম থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ শেষে সকাল সাড়ে সাতটায় স্কুলের শহিদ মিনারে এসে শেষ হয়। এ সময় শত শত শিক্ষার্থী ও স্থানীয় শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণী ও বয়স্ক ব্যক্তিরা হাতে ফুল নিয়ে শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে সমবেত হন। সর্বপ্রথম শহিদ মিনারের পাদদেশে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তারপর একে একে শহিদ মিনারের বেদিতে সকলেই পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ সময় শ্রদ্ধাভরে সমবেত কণ্ঠে সবাই গেয়ে ওঠে-আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি। তারপর শহিদ মিনারের পাদদেশে নির্মিত মঞ্চে প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে শুরু হয় আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শিক্ষকবৃন্দ ও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এ সময় তাঁদের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। সবশেষে প্রধান শিক্ষক তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন, 'মহান একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল দিন। একুশের মহান আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের পথ ধরেই পরবর্তীকালে সব রাজনৈতিক আন্দোলন ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৯ সংঘটিত হয় এবং ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীবিত হয়েই পরিচালিত হয়। পরিশেষে ১৯৯৯ সালে একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের মহান আত্মত্যাগের চেতনাকেই স্বীকৃতি দেয় বিশ্ব। আমাদের দেশের একুশে ফেব্রুয়ারি হয়ে ওঠে সারা বিশ্বের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এর চেয়ে বড়ো অর্জন আমাদের জীবনে আর কিছু হতে পারে না। তাই আজ আমাদের শপথ গ্রহণের দিন। সকল প্রকার শোষণ, অন্যায়, অবিচার ও অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর দিন এই একুশে ফেব্রুয়ারি।'

আলোচনা সভার পর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে অংশগ্রহণ করে স্কুলের শিক্ষার্থীরা। ভাষার গান, দেশাত্মবোধক গান, গণসংগীত ও একুশের কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে একুশের অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠে অনবদ্য এক প্রেরণার উৎস। একুশের চেতনা আমাদের সামাজিক জীবন এবং জাতীয় পর্যায়ে ঐক্য ও সম্প্রীতির অন্তহীন অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠার মাহেন্দ্রক্ষণরূপে বারবার ফিরে আসুক- এই কামনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে।

বৃক্ষরোপণ বিষয়ক সংবাদ প্রতিবেদন

অথবা, মনে করো, তুমি ফরহাদ 'একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার প্রতিনিধি। পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য চাই বৃক্ষরোপণ'-এ শিরোনামে পত্রিকার প্রকাশ-উপযোগী একটি প্রতিবেদন তৈরি করো।

অথবা, মনে করো, তুমি সোহাগ। 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকার একজন প্রতিনিধি। পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব বর্ণনা করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করো।

অথবা, মনে করো, তুমি তাপস। 'দৈনিক বিশ্বকাপ' পত্রিকার একজন প্রতিনিধি। পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব বর্ণনা করে পত্রিকার প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন লেখো।

অথবা, 'পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য বৃক্ষরোপণ'-এ শিরোনামে পত্রিকার প্রকাশের উপযোগী একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য চাই বৃক্ষরোপণ

ফরহাদ, ঢাকা, ২০ জুলাই ২০২৫। প্রতের অস্তিত্ব ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গাছপালার কোনো বিকল্প নেই। গাছ প্রবহমান প্রক্রিয়া ও বাষ্পীভবনের মাধ্যমে আবহাওয়া বিশুদ্ধ রাখে, মাটির উর্বরতা বাড়ায়, মাটির ক্ষয়রোধ করে, ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে রক্ষা করে প্রকৃতিকে, বন্যা প্রতিরোধ করে। অর্থাৎ মানুষের বসবাস-উপযোগী ভারসাম্যপূর্ণ পৃথিবী বৃক্ষের অবদান।

একটি দেশে মোট ভূভাগের ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু সরকারি হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ ১৭ শতাংশ। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের সুন্দরবনকে বাদ দিলে বন বলতে যা অবশিষ্ট থাকে, তা ওয়ার্ল্ড রিসোর্সেস ইনস্টিটিউটের মতে মাত্র ৫ শতাংশ। দিন দিন জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এ বনভূমির পরিমাণ আরও হ্রাস পাচ্ছে।

বনভূমির এ আশঙ্কাজনক হ্রাস আমাদের পরিবেশ বিপণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। বাতাস দূষিত হচ্ছে, ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে মাটি। পর্যাপ্ত বনভূমি না থাকায় অনাবৃষ্টি দেখা দিচ্ছে। ফলে ক্রমে নেমে যাচ্ছে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর। আমাদের নগরজীবন থেকে যেন ছায়াশীতল, নিরুষ্কতা একেবারেই হারিয়ে গেছে, এলাকাজুড়ে আনুপ পরিবর্তন এ দায়ী হচ্ছে পরিবেশ। এ অবস্থা পরিবর্তন না করলে বিকল্প নেই।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশকে বাঁচানো ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনায়নের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর বনায়নের জন্য প্রয়োজন জনগণের সচেতনতা ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা। জাতীয় গণমাধ্যমগুলো এ বাপারে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখতে পারে। আর এগিয়ে দিকে তদারকি করার জন্য ওয়ার্ড মেম্বারের নেতৃত্বে শিক্ষক, সমাজকর্মী, মসজিদের ইমাম প্রমুখের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করতে হবে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এ মহতী উদ্যোগের অংশীদার করতে পারলে ভালো ফল পাওয়া যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। জীবনের জন্য, জীবিকার জন্য বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই বৃক্ষরোপণের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনায় এনে জাতীয়ভাবে কর্মসূচি গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

রংপুরে সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ইসরাত জাহান, রংপুর, ১১ নভেম্বর ২০২৫ ॥ প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও রংপুর জেলা সদরে অনুষ্ঠিত হলো রংপুর জেলাভিত্তিক সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতা। জেলা পর্যায়ের এই প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে উপজেলা থেকে নির্বাচিত ও বিজয়ী শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। রংপুর জেলা সদরে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ৯ নভেম্বর, ২০২৫। স্থানীয় অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানটির শুভ উদ্বোধন করেন রংপুর জেলা প্রশাসক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মহোদয় এবং স্থানীয় রংপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি পরিণত হয় আলোচনা সভায়। জেলা শিক্ষা অফিসারের শুভেচ্ছা ভাষণের পর পুলিশ সুপার বক্তব্য রাখেন। মূল বক্তব্য তুলে ধরেন আয়োজকের ভাষণে। তিনি শিক্ষার ইতিহাস, বাংলাদেশের শিক্ষার অতীত ও বর্তমান অবস্থা আলোচনা প্রসঙ্গে সুন্দর হাতের লেখার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন। প্রধান অতিথির ভাষণে জেলা প্রশাসক এই প্রতিযোগিতাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরপরই শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। উপজেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয় গত তিন দিন আগে। উপজেলার বিজয়ী শিক্ষার্থীরা জেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।
প্রতিযোগীদের একত্র প্রতিযোগিতামূলক প্রয়াস দর্শকদের কাছে অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছিল। সকাল ১০টায় শুরু হয় প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগীদের অবস্থা ছিল 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী'-এর মতো। বিচারকগণ বিচারকার্য পরিচালনা করতে গিয়ে বারবার হিমশিম খাচ্ছিলেন এই ভেবে যে, কাকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দেবেন। সবাই যে সমান মেধা নিয়ে এসেছে। তারপরও বিচারকার্য সম্পন্ন হয়েছে; নির্বাচিত হয়েছে শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী।
সন্ধ্যা ৫টায় বিজয়ী প্রতিযোগীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। জেলা প্রশাসক বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। পুরস্কার ছিল একটি ক্রেস্ট এবং মূল্যবান বই। জেলা প্রশাসক বিজয়ীদের অভিনন্দন জানান এবং অন্যদের হতাশ না হওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের সকলের হাতের লেখাই সুন্দর। কিন্তু প্রতিযোগিতায় সকলেই প্রথম হতে পারে না। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারাটাই আসল কথা।
পরিশেষে, দেশ ও জাতির সমৃদ্ধির আশাবাদ ব্যক্ত করে সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

নিরাপদ সড়ক চাই

জেলা প্রতিনিধি, সিলেট, ২৬ আগস্ট ২০২৫ ॥ নিরাপদ সড়কের দাবিতে গতকাল ২৫ আগস্ট সোমবার সিলেট শহরের কোর্ট পয়েন্টে অনুষ্ঠিত হয়েছে এক বিশাল জনসমাবেশ। উল্লেখ্য, কিছুদিন ধরে সিলেট শহরের বিভিন্ন স্থানে ক্রমাগত সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। ১৮ আগস্ট আখরখানা-বিমানবন্দর সড়কে ট্রাকের সাথে প্রাইভেটকারের মুখোমুখি সংঘর্ষে লন্ডন ফেরত একই পরিবারের তিনজনের মৃত্যু হয়। পরবর্তীতে জানা যায়, ট্রাকটি চালাচ্ছিল চালকের সহকারী। এরই ধারাবাহিকতায় সোমবারী এলাকায় ২০ আগস্ট বেপরোয়া পিকআপের চাপায় পিষ্ট হয় দুজন পথচারী। তার পরদিন শেখঘাট এলাকায় মৃত্যুর মিছিলে যুক্ত হয় দুজন স্কুল শিক্ষার্থী। স্কুল শেষে বাড়ি ফেরার সময় লরির ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়। সড়কে এই ক্রমাগত প্রাণহানির প্রতিবাদে এবং নিরাপদ সড়কের দাবিতে গতকালের এই বিশাল জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সর্বস্তরের মানুষ যোগদান করে। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। তারা 'নিরাপদ সড়ক চাই' দাবি সম্বলিত বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড ও পোস্টার প্রদর্শন করে। সমাবেশে বক্তারা গত এক বছরের সিলেটে সড়ক দুর্ঘটনার খতিয়ান তুলে ধরেন। তারা অভিযোগ করেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তির উপযুক্ত শাস্তি না হওয়ায় সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করা যাচ্ছে না। ড্রাইভারদের অভ্রাসচ্ছন্নতা, বেপরোয়া গতি, বিপজ্জনক ওভারটেকিংকে বক্তারা সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুর্ঘটনায় অভিযুক্তদের আইনের আওতায় আনা এবং সড়ক শৃঙ্খলা ফেরানোর ব্যাপারে আশ্বাস দেওয়া হয়। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল নগরীর বিভিন্ন জায়গা প্রদক্ষিণ করে এসে কোর্ট পয়েন্টে এসে শেষ হয়। এ সময় শহরের বিভিন্ন সড়কে দেখা দেয় অসহনীয় যানজট।

ময়মনসিংহে বিজয় দিবস উদযাপিত

জেলা প্রতিনিধি, ময়মনসিংহ, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ ॥ দিনব্যাপী বিভিন্ন আয়োজন ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মাধ্যমে ময়মনসিংহে মহান বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে নগরীর টাউন হল মিলনায়তনে প্রধান অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, ছাত্র-শিক্ষক, বিভিন্ন পেশাজীবী ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বিজয় দিবসের বিভিন্ন আয়োজন হয়ে ওঠে উৎসবমুখর ও প্রাণচঞ্চল। সকাল আটটায় ময়মনসিংহের বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসক মহোদয়ের নেতৃত্বে বিজয় র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটি নগরীর বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করে টাউন হল প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। সেখানে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহিদের আত্মার শান্তির কামনা করে মোনাজাত করা হয়, বিকেলের দিকে সেই খাবার, র‍্যাগদ অর্থাৎ বিশেষ খেলার শেষে উপকরণ। তারপর মিলনায়তনে আলোচনা হয় মূল আলোচনা সভা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডার, শিক্ষক, সাংবাদিকসহ স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিভাগীয় কমিশনার বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধ এদেশের মানুষের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। স্বাধীনতার জন্য বাঙালি জাতি সবচেয়ে বেশি রক্ত দিয়েছে; স্বীকার করেছে অবর্ণনীয় ত্যাগ। শহিদদের সেই আত্মত্যাগ বৃথা হয়ে যাবে যদি আমরা সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে কাজ না করি, উপরাপতা ও ন্যায়াচার রক্ষিত করতে না পারি। আমাদের সবাইকে হতে হবে স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী।' বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদানকালে জেলা প্রশাসক স্বাধীনতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করে যুদ্ধজয়ী জাতি হিসেবে বাংলাদেশের অযাত্রার একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেন। আলোচনা সভার পর জমকালো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

ভাবসম্প্রসারণ

১৪ টি

১।

> *অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে*
> *তব ঘৃণা যেন তাহে তৃণসম দহে।*

ভাবসম্প্রসারণ: যে অন্যায় করে এবং যে সেই অন্যায় সহ্য করে, তারা উভয়ে সমান অপরাধী উভয়ে সমান ঘৃণার পাত্র। আইনের দৃষ্টিতে অন্যায়কারীকে অপরাধী মেনে করা হয়। তাই তার জন্য শাস্তির বিধান থাকে। আবার অনেক মানুষ আছে তারা সরাসরি অন্যায় করে না, কিন্তু পেছনে থেকে অন্যায়কারীকে সহায়তা করে বা অন্যায় করতে উৎসাহিত করে। আইনের আওতায় এরাও কখনো কখনো অপরাধী হিসেবে গণ্য হয়। আবার, এমনও লোক থাকে যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্যায় করে না, অন্যায় ঘটার সময়ে শুধু নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। আইনের চোখে তাদের অপরাধী বলা যায় না। আইনের চোখে অপরাধী না হলেও এই নীরব দর্শকেরাও এক অর্থে অন্যায় ঘটাতে সহযোগিতা করে। কেননা, অন্যায় সংঘটিত হওয়ার সময়ে ওইসব দর্শক যদি সরব প্রতিবাদীর ভূমিকা পালন করত, তাহলে অন্যায় ঘটত না। আইনের চোখে এরা হয়তো অপরাধী নয়, কিন্তু বিবেকের দায় থেকে তাদের মুক্তি পাওয়া যায় না। সমাজ থেকে অন্যায়কে দূর করতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বিবেকের দায়সম্পন্ন সচেতন মানুষের উপস্থিতিও জরুরি, যারা অন্যায়ের প্রতিবাদে সব সময়ে সোচ্চার হবে, সরব হবে। অপরাধী যাতে অপরাধ করার সুযোগ না পায়, সবাইকে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। অন্যায়কারীকে যথাযথভাবে শাস্তি দিলে অন্যায় প্রশ্রয় পায় না। আবার অন্যায় করতে না দিলে অন্যায়ের ঘটনা ঘটে না। তাতে সমাজ থেকে অন্যায় চিরতরে দূর হয়। তাই অন্যায়কারী এবং অন্যায়-সহকারী উভয়ই সমাজে নিন্দনীয়।

২।

> *আপনি আচরি ধর্ম শিখাও অপরে।*

ভাবসম্প্রসারণ: ব্যক্তির জীবনাচরণের মেধা যা নেই, তা অন্যকে উপদেশ আকারে দেওয়া যায় না। অন্যকে উপদেশ দেওয়ার আগে নিজেকে তা পালন করে দেখাতে হয়। এর ফলে যাকে উপদেশ দেওয়া হয়, সে তা পালন করতে আন্তরিকভাবে উদ্বুদ্ধ হয়। কাউকে উপদেশ দেওয়া যত সহজ, উপদেশ পালন করা তার চেয়ে অনেক কঠিন। যে উপদেশ দেয়, সে যদি নিজে তা পালন না করে, তাহলে উপদেশ-গ্রহণকারীর কাছে এর গুরুত্ব থাকে না। অন্যদিকে উপদেশ দানকারী যদি সেই উপদেশের পালনীয় দিক নিজ জীবনে পালন করে দেখান, তাহলে উপদেশ-গ্রহণকারী উপদেশ পালনের দৃষ্টান্ত পেয়ে যান, যা তার জীবনাচরণে সক্রিয় প্রভাব ফেলে। সাধারণত ধর্মপ্রবক্তা, ধর্মাচারক, জ্ঞানী ব্যক্তি বা জীবনে প্রতিষ্ঠাপ্রণেদর তরফ থেকে উপদেশ-বাণী বর্ষিত হয়ে থাকে। এঁদের দেওয়া উপদেশ মানুষ পালন করতে দ্বিধা করে না। তবে উপদেশ হিসেবে বর্ণিত কথাটুকু তারা নিজেদের জীবনেও অনুসরণ করেন কি-না এ বিষয়ে তাঁদেরকে সতর্ক থাকতে হয়। সমাজে অনেক মানুষ থাকে, যারা উপদেশ দিতে খুব পটু, কিন্তু ওইসব উপদেশ তারা নিজেরাই পালন করতে অভ্যস্ত নয়। তখন উপদেশগুলো উপদেশ-গ্রহণকারীর কাছে সেইভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো একজন লোক নিয়মিত ধূমপান করে, আবার সে যদি অন্যকে ধূমপান করতে নিষেধ করে, তাহলে তা হাস্যকর উপদেশে পরিণত হয়। তাই কোনো একটা ভালো কাজ করতে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করার আগে উপদেশদাতাকেই ভালো কাজটি করতে অভ্যস্ত হতে হবে। তাতে উপদেশ-গ্রহণকারী উপদেশের পাশাপাশি উপদেশ পালনের নজিরও গ্রহণ করতে পারে। কাউকে উপদেশ দেওয়ার মধ্য দিয়ে ভালো মানুষ সাজার ভান করা খুব সহজ, কিন্তু উপদেশ পালন করা খুব কঠিন কাজ। তবে সেই উপদেশদাতাই সর্বোত্তম, যিনি নিজে যা পালন করেন, অন্যেকও তা পালন করতে বলেন।

৩।

> *ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়;*
> *পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।*

ভাবসম্প্রসারণ: ক্ষুধার্ত মানুষের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ক্ষুধিবৃত্তি। সব কিছুর মধ্যেই সে ক্ষুধা নিবৃত্তির কথা ভাবে। তখন কোনো কিছু সুন্দর কি অসুন্দর, তা তাকে ভাবায় না। প্রতেক মানুষের বেঁচে থাকার জন্য কতগুলো মৌলিক চাহিদা রয়েছে। খাদ্য হলো এর মধ্যে প্রধান মৌলিক চাহিদা। খাদ্য ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। মানুষের শরীরে তৈরি হওয়া এই খাওয়ার চাহিদারই অপর নাম ক্ষুধা। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য মানুষ সব কিছু করতে পারে। মানুষ যে দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে, তার পেছনে এই ক্ষুধিবৃত্তি মূল চালিকাশক্তি। ক্ষুধা নিবৃত্ত হওয়ার পরেই মানুষ অন্যান্য মৌলিক চাহিদার কথা ভাবে। বাসস্থানের কথা ভাবে, পোশাকের কথা ভাবে, স্বাস্থ্যের কথা ভাবে। সুন্দর-অসুন্দরের কথা তাকে একেবারে শেষ পর্যায়ে। তাই ক্ষুধা যখন মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, তখন সৌন্দর্যের মূল তার কাছে থাকে না। একজন সুখী মানুষের কাছে পূর্ণিমাকে সুন্দর মনে হতে পারে। কিন্তু ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে তা নাও হতে পারে। অতীতে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে মারা যেত। সামান্য দুটো রুটির জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে সারাদিন পরিশ্রম করতে হতো। সেই দুর্ভিক্ষে একজন শ্রমজীবীর কাছে পূর্ণিমার চাঁদ বড়ো জোর একখানা ঝলসানো রুটির মতো মনে হবে, সেটাই স্বাভাবিক। ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে পূর্ণিমার সৌন্দর্য কোনো তাৎপর্য বহন করে না। ক্ষুধা নিবারণের জন্য তার সবচেয়ে আগে দরকার খাদ্য। গদ্যের কাঠিনতাটুকু সে ভালো উপলব্ধি করতে পারে; কাব্যের কোমলতা তার কাছে অধীহীন।

৪।

> *গ্রন্থগত বিদ্যা আর পরহস্তে ধন,*
> *নিজ বিদ্যা নহে ধন নহে হলে প্রয়োজন।*

ভাবসম্প্রসারণ: ধন-সম্পদ যদি নিজের নিয়ন্ত্রণে না থাকে, তবে দরকারের সময়ে তা কোনো কাজে আসে না। একইভাবে জ্ঞান যদি শুধু বইয়ের পাতায় আটকে থাকে, সে-বিদ্যা ব্যক্তি তার নিজের জীবনে কাজে লাগাতে পারে না। মানুষের অভিজ্ঞতা ও প্রমাণ-লব্ধ জ্ঞান বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। বই পাঠ করলে পৃথিবীর সব ধরনের জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। কেউ যদি নিয়মিত বই পড়ে তাহলে সে ধীরে ধীরে নিজেকে জ্ঞানী করে তুলতে পারে। বই থেকে অর্জিত এই জ্ঞান দিয়ে সে নিজের বা অন্যের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। বই থেকে আহরিত জ্ঞান থেকে সে নিজে যেমন আলোকিত হতে পারে, অন্যেকও আলোকিত করতে পারে। কিন্তু জ্ঞান যদি বইয়ের মধ্যেই শুধু আবদ্ধ থাকে, তাহলে তা কারো কোনো কাজে আসে না। ধরা যাক, কোনো ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে হাজার হাজার বই কিনলেন আর তা দিয়ে লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা করলেন। লাইব্রেরির তাকে তাকে বইগুলোকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখলেন। কিন্তু জ্ঞানের কোনো বিষয়ে কেউ যদি তাঁকে প্রশ্ন করে, তিনি তার যথাযোগ্য জবাব দিতে ব্যর্থ হবেন। আবার বইয়ের বিদ্যা না বুঝে কেবল ঠোঁটস্থ বা মুখস্থ করলেই হবে না। এই বিদ্যার প্রায়োগিক দিকটিও তাৎপর্য বহন করে। অনেকটা জায়গা-জমি বা অর্থের মতো। নিজের সম্পদ-সম্পত্তি অন্যের হাতে থাকলে তা ভোগ করা যায় না। অন্যের কাছে থাকা অর্থ আর বইয়ের পাতার সীমাবদ্ধ জ্ঞান এভাবে সমার্থক হয়ে যায়। বইকে শুধু পরীক্ষা পাশের উপকরণ মনে করলে চলবে না। বইয়ের জ্ঞানকে জীবনে কাজে লাগাতে পারলে তবেই সার্থকতা।

৫।

> *জন্ম হোক যথা তথা, কর্ম হোক ভালো।*

ভাবসম্প্রসারণ: কর্মের দ্বারাই মানুষ পৃথিবীর বুকে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা পায়। কোনো মানুষের জন্ম যে বংশেই হোক না কেন, কাজই তার পরিচয় নির্ধারণ করে। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী মানুষকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয়। তখন পিছনে পড়ে থাকে তার ভালো-মন্দ সব ধরনের কাজ। কাজ ভালো হলে বহু কাল যাবৎ মানুষ তা মনে রাখে। আর কাজ খারাপ হলে যুগ যুগ ধরে সকলে তার নিন্দা করে। বংশমর্যাদার উপরে এইসব সুনাম বা দুর্নাম নির্ভর করে না। বংশে কেউ একজন সুনাম করলে সেই বংশের মর্যাদা বাড়ে। তবে তার অর্থ এই নয় যে, এই মর্যাদা চিরস্থায়ী। কেননা, একই বংশে কোনো কুলাঙ্গার জন্ম নিলে সেই মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হতে পারে। আবার, অনেক খুব সাধারণ পরিবারে জন্ম নিয়েও নিজ নিজ কৃতিত্বের জন্য পৃথিবীতে অমর হয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন, আবার কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেছেন দরিদ্র পরিবারে। এ দুজন ব্যক্তি বংশ পরিচয়ে নয়, বরং কর্ম দ্বারা মানুষের কাছে পরিচিত হয়েছেন। মানুষের পরিচয় কখনোই তার বংশ বা পরিবারের মর্যাদা-অমর্যাদার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে তার নিজ নিজ কর্ম ও সুকৃতির উপর। বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, মানবসেবা পছন্দসই যে কোনো ক্ষেত্রে মানুষ নিজেকে উৎসর্গ করে অমর হতে পারে।

৬।

> *দুজন বিষান হইলেও পরিত্যাজ্য।*

ভাবসম্প্রসারণ: দুজন মানে খারাপ লোক। খারাপ লোক যতই শিক্ষিত হোক না কেন, তার সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত। সাধারণত মিথ্যাবাদী, দুর্নীতিপরায়ণ ও চরিত্রহীন লোককে এককথায় দুর্জন বলা হয়। যারা খারাপ লোক, তাদের কথায় ও আচরণে খারাপ স্বভাব প্রকাশ পায়। খারাপ লোক শিক্ষিত হতে পারে, উচ্চশিক্ষিত হতে পারে; আবার নিরক্ষরও হতে পারে। অর্থাৎ কারো খারাপ হওয়ার সঙ্গে শিক্ষিত হওয়া বা না-হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। যারা খারাপ লোকের সঙ্গে মেশে, তাদের সবাই খারাপ লোক মনে করে। এজন্য খারাপ লোকের সঙ্গ ত্যাগ করতে হয় এবং তেমন লোকের কাছ থেকে দূরে থাকতে হয়। একসময়ে এই বিশ্বাস করা হতো-কোনো কোনো বিষধর সাপের মাথায় মণি আছে। কিন্তু মণি আছে বলে সাপের সঙ্গে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তেমনি দুর্জন লোক শিক্ষিত হলেও তার সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত। দুর্জন লোক অপরের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা কখনো পায় না। তার কাছ থেকে সঙ্গীর কিছু শেখার নেই। এমনকি, দুর্জনের কারণে সঙ্গীর বিপদও হতে পারে। বিপরীতভাবে, ভালো লোক নিরক্ষর হলেও তার সঙ্গ প্রীতিকর হয়। ভালো লোকের কাছ থেকে তার সঙ্গীর বিপদ ঘটার সম্ভাবনা থাকে না। সচ্চরিত্র গঠন করা বিদ্যা অর্জন করার চেয়েও কঠিন কাজ। তাই যিনি চরিত্রবান, তার বিদ্যা থাক বা না-থাক, তার সঙ্গ প্রত্যাশিত। অন্যদিকে চরিত্রহীন ব্যক্তি বিদ্বান হলেও তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখাটা ফটিকর।

৭।

> *প্রাণ থাকলেই প্রাণী হয়, কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না।*

ভাবসম্প্রসারণ: খাদ্য গ্রহণ করে, শারীরিকভাবে বাড়ে আর বংশ বৃদ্ধি করে মোটামুটি এসব বৈশিষ্ট্য থাকলে কোনো কিছুর প্রাণ আছে বলে মনে করা হয়। মানুষেরও প্রাণ আছে, কিন্তু মানুষের থাকে এর অতিরিক্ত আর একটি সত্তা, তা হলো মন। মানুষকে বলা হয় সৃষ্টির সেরা জীব সেরা প্রাণী। মূল কারণ তার মন আছে। এই মনের মাধ্যমে মানুষ তার চারপাশের জগতের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলে। তার মেধা ভালো-মেন্দর ধারণা সৃষ্টি করে, নৈতিকতার জন্ম দেয়। এমনকি এই মন দিয়ে সে গড়ে তোলে তার নিজস্ব সংস্কৃতি। এই সাংস্কৃতিক বোধ তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক উপাদান। মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর মেধা এইসব উপাদান থাকে না। ইতর প্রাণীর মন থাকে না বলে তার সংস্কৃতি নেই, তার ভালো-মেন্দর বোধ নেই, তার নৈতিকতার বালাই নেই। মানুষের মন এভাবে অন্যান্য প্রাণী থেকে তাকে আলাদা করে। মনকে আবার অনেক সময়ে ভালো কিছুর কেন্দ্র হিসেবেও ভাবা হয়। যেমন, যখন কোনো ব্যক্তির দানশীলতার কথা বলা হয়, তখন বলা হয়, তার মন আছে। আবার কোনো লোককে যখন চরম স্বার্থপর ও কৃপণ হিসেবে চিত্রিত করার দরকার হয়, তখন বলা হয়, লোকটার মন ছোটো। এদিক দিয়ে মন হলো মানুষের ভালো-মন্দ পরিমাপের এক ধরনের মাপকাঠি। মানুষের মন আছে বলেই সে মানবিক গুণের অধিকারী। আর যার মন নেই, অবশ্যই সে ইতর প্রাণীর সঙ্গে তুলনীয়। সেই ইতর প্রাণী হতে পারে চরমভাবে হিংস্র অথবা একাকুই গোবেচারা কোনো পশু, পাখি বা মাছ।

৮।

> *বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয় না।*

ভাবসম্প্রসারণ: জ্ঞান আহরণ করার আশা নিয়ে মানুষ বই কেনে। আর এই বই কেনার জন্য যে অর্থ-ব্যয় হয়, অর্জিত জ্ঞানের তুলনায় তা খুব নগণ্য। বই মানুষের জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়ে মেনের জগৎকে প্রসারিত করে। কূপমণ্ডুকতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বিশ শতকের সূচনায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের দার্শনিকগণ বলেছিলেন, 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'। তাদের ধারণা অনুযায়ী বই, বুদ্ধিহীনতার সীমানা বাড়াতে, আর মানুষের মুক্তি আনতে বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। সব মানুষই খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করে। মৌলিক চাহিদা পূরণের পর অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করার আরো অনেক উপায় আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে ভালো উপায় বই কেনা। বই কিনে কেউ নিঃস্ব হয় না। কারণ, একটা বইয়ের অর্থমূল্য বেশি নয়। বরং একটি বই কিনতে যে অর্থের প্রয়োজন হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি অর্থ অনেকান্য কাজে ব্যয় করে থাকে। ব্যক্তিকে আলোকিত করতে, সমাজে যেভাবে ভূমিকা রাখে, তাতে বই কেনার ব্যাপারে কার্পণ্য করা বোকামি। একটা বই অনেক সময়ে মানুষের জীবনকে পর্যন্ত বদলে দিতে পারে। বই মানুষের প্রকৃত বন্ধু। তাই নিজেকে সমৃদ্ধ করতে বই কেনার ও তা পড়ার কোনো বিকল্প নেই।

৯।

> *বার্ধক্য তাহাই যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে।*

ভাবসম্প্রসারণ: কেবল বয়সের মাপকাঠিতে তারুণ্য বা বার্ধক্যকে বিচার করা যায় না। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ও কর্মস্পৃহার তারতম্য মানুষকে তরুণ ও বৃদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করে। মানুষ শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য ও যৌবন পেরিয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়। এ বার্ধক্য ব্যক্তির নানা ধরনের শারীরিক সক্ষমতা হ্রাস করতে পারে ঠিকই, কিন্তু সবাইকে মানসিকভাবে জরাগ্রস্ত করতে পারে না। এদের কর্মশক্তি ও মানসিক-শক্তি অনেক তরুণকে হার মানায়। পক্ষান্তরে, এমন অনেক তরুণ রয়েছে যারা নতুনকে গ্রহণ করতে পারে না, অন্ধবিশ্বাস ও গতানুগতিক চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকে, সত্যকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়। তারা আসলে তারুণ্যের খোলসে বার্ধক্যের লালন করে। আর যেসব বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়, ইতিবাচক ভাবনায় জীবনকে পরিচালিত করে, তারা প্রকৃতপক্ষে তারুণ্যের অনিঃশেষি ধারণ করে। তরুণরা সব সময়ে আলোর পথের যাত্রী। কঠিন সত্যকে মেনে নিয়ে তারা নতুন ইতিহাস রচনা করতে পারে। যুক্তির আলোয় কুসংস্কারের বাতিল করে তারা প্রতিষ্ঠা করে নতুন সত্য। তারা ক্লান্তি ও মৃত্যুকে পিছনে ফেলে সৃষ্টির আনন্দে এগিয়ে যায়। তারুণ্যের এই বোধ ও অনুভূতি যে কোনো বয়সের মানুষের মধ্যে থাকতে পারে। প্রকৃত বৃদ্ধ তারা, যারা তারুণ্যের দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নিতে চায় না, সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনকে অস্বীকার করে, নতুন সূচের আলোয় অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। তারা তারুণ্যের অগ্রযাত্রায় অংশ নেওয়ার পরিবর্তে বিষ সৃষ্টি করে। বার্ধক্যের পরিচয় বয়সে নয়, পশ্চাদমুখী দৃষ্টিভঙ্গিতে।

১০।

> *বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কহীন জীবন অন্ধ এবং জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিদ্যা পঙ্গু।*

ভাবসম্প্রসারণ: বিদ্যা মানুষের জীবনকে উন্নত করে। তাই বিদ্যা অর্জন অত্যাবশ্যক। তবে যে বিদ্যার সঙ্গে বাস্তব জীবনের কোনো সংযোগ নেই, সে বিদ্যা অকার্যকর। মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে বিদ্যাচর্চা করতে হয়। প্রকৃত বিদ্বান ব্যক্তি জীবনকে মহীয়ান করে গড়ে তোলেন। তিনি নিজে যেমন আলোকিত হন, তেমনি আলোকিত করেন পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে। অপরদিকে বিদ্যাহীন মানুষ সমাজের বোঝাস্বরূপ। সে অজ্ঞানতার মধ্যে ডুবে থাকে। একমাত্র বিদ্যাই পারে সেই অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে তাকে মুক্ত করতে। একজন প্রকৃত জ্ঞানী মানুষ জীবনের বাস্তবতাকে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারে। বিদ্যা তাকে জ্ঞানী করে, বিদ্যাই তার চিন্তা-ভাবনা ও আচার-ব্যবহারকে পরিশীলিত করে। এমনকি সংস্কৃতিবান ও উদার দৃষ্টির মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতেও বিদ্যার কোনো বিকল্প নেই। তবে কিছু বিদ্যা মানুষের জীবনে সরাসরি প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন এসব বিদ্যা অর্জন করা অর্থহীন। মুখস্থ বিদ্যা আর গ্রন্থগত বিদ্যা মানুষের ব্যবহারিক জীবনে কোনো কাজে আসে না। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিদ্যা মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথ দেখায় না, কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে দৃষ্টিভঙ্গিকে উদার করে না, এমনকি জীবনকে এগিয়ে নেওয়ার পরিবর্তে পিছিয়ে দেয়। এমন বিদ্যা অবশ্যই কাঙ্ক্ষিত নয়। প্রকৃত শিক্ষা জীবনের সব দিককে আলোকিত করে। সেই আলোয় উদ্ভাসিত হয় ব্যক্তি ও সমাজ। অন্যদিকে যে বিদ্যা জীবনকে ইতিবাচক পথে চালিত করতে পারে না, সে বিদ্যা মূল্যহীন।

১১।

> *মানুষ বাঁচে তার কর্মের মধ্যে, বয়সের মধ্যে নয়।*

ভাবসম্প্রসারণ: দীর্ঘ জীবন নয়, বরং মহৎ কর্মের মধ্যে মানবজীবনের সার্থকতা নিহিত। কর্মগুণে মানুষ অনেকে হৃদয়ে জায়গা করে নেয়। মানুষ অনন্তকাল বেঁচে থাকে না। একেক মানুষ একেক রকম আয়ু ভোগ করে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। এমন অনেক মানুষ আছে, যারা দীর্ঘকাল পৃথিবীতে বেঁচে থাকে, কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তারা অনেকের কাছে বিস্মৃত হয়ে যায়। কারণ, তাদের জীবন বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে উল্লেখ করার মতো হয় না তারা এমন কোনো কাজ করে যেতে পারে না, যার কারণে মানুষ তাদের শ্রদ্ধা করে। তাই দীর্ঘায়ুর অধিকারী হলেও সেসব ব্যক্তি জীবনকে গৌরবান্বিত করতে পারে না। পক্ষান্তরে এমন অনেক মানুষ আছেন, যারা স্বল্প আয়ুর জীবনে নিজেকে স্মরণীয় করে গেছেন। যুগ যুগ ধরে তাঁদের নাম উচ্চারিত হয়। পৃথিবীতে মহৎ হৃদয়ের মানুষ মানবতার কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেন, দেশ ও জাতির স্বার্থে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। একুশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে গভীর জীবনবোধ ও মহৎ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। ভাষা আন্দোলনে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, সেই রফিক, শফিক, বরকত, জব্বার, তারা সকলেই ছিলেন বয়সের দিক দিয়ে একেবারে তরুণ। অর্থাৎ স্মরণীয়-বরণীয় হওয়ার জন্য বয়স গুরুত্বপূর্ণ নয়। জীবনটা বেশি দিনের বা কম দিনের, সেটা মোটেই বিবেচ্য নয়। বিবেচ্য হলো মহৎ কর্ম করে বেঁচে থাকা। মহৎ কর্মের মাধ্যমে যারা জীবনকে মহিমান্বিত করে তুলতে পারেন, প্রকৃত অর্থে তারাই দীর্ঘজীবী বা চিরজীবী।

১২।

> *মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে,*
> *হারা শশীর হারা হাসি, অন্ধকারেই ফিরে আসে।*

ভাবসম্প্রসারণ: মানুষের জীবনে সুখ বা দুঃখ চিরস্থায়ী নয়। সুখের পরে দুঃখ আসে, আবার দুঃখের পরে সুখ আসে। এজন্য সুখে যেমন অতিরিক্ত আহ্লাহারা হওয়া ঠিক না, তেমনি বিপদে ও দৈন্যদশায় ধৈর্যহারা হওয়া ঠিক নয়। আকাশ যখন মেঘে আচ্ছন্ন হয়, সূর্য বা চাঁদের আলো তখন ঠিকমতো পৃথিবীতে পৌঁছায় না। ফলে দিনের বেলায় সূর্য দেখা যায় না, রাতের বেলায় চাঁদ দেখা যায় না। কিন্তু এমন ঘটনা খুবই সাময়িক। দিনের অধিকাংশ সময়ে সূর্য দেখা যায়। একইভাবে মেঘও চাঁদকে বেশিক্ষণ আড়াল করে রাখতে পারে না। পূর্ণিমার রাতে চাঁদের হাসি তাই সবাইকে দেখার সুযোগ হয়। অর্থাৎ পৃথিবীতে মেঘের আড়াল যেমন সত্য, মেঘহীন আকাশও সত্য। বিপদেও মানুষের জীবনে কখনো কখনো মেঘ-দুর্দশার মেঘ হাজির হয়। মেঘ হয়, এই দুর্দশা যেন আর কাটে না। দুর্বলচিত্তের মানুষ তখন দিশেহারা হয়ে পড়ে। কিন্তু তারা ভুলে যায়, মানুষের জীবনে কোনো কিছুই নিরবচ্ছিন্ন নয়। জীবন-আকাশের এই কালো মেঘও বাস্তব মেঘের মতো সাময়িক। এজন্য বিপদে ভেঙে না পড়ে দৃঢ়তার সঙ্গে তা মোকাবিলা করতে হয়। মানুষের জীবনে কোনো দুঃসময়ই চিরস্থায়ী বা অনিবার্য নয়। ধৈর্য ধরে দুঃসময়কে অতিক্রম করতে পারলেই সুখ-সূর্য বা সুখ-চাঁদের দেখা মেলে। জীবন তখন পুনরায় সুন্দর ও উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

১৩।

> *ভোগে নয়, ত্যাগেই মনুষ্যত্বের বিকাশ।*

ভাবসম্প্রসারণ: ভাগের মধ্য দিয়ে প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ভোগের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় ব্যক্তির লোভ-লালসা। তাই ভোগ নয়, ভাগের চর্চাই মানুষের সুন্দর গুণাবলিকে উৎকর্ষ দান করে। ভোগ ও ত্যাগ দুটি বিপরীত বিষয়। মানুষ ইন্দ্রিয় সুখের আশায় ভোগে মত্ত হয়; অন্যদিকে মানসিক তৃপ্তির আশায় ত্যাগ স্বীকার করে। ভোগ সাময়িক সুখ আনতে পারে। তবে যিনি ভাগে কুণ্ঠিত হন না, তিনি অনাবিল আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। ভোগের নিমিত্তে মানুষ জুড়িয়ে যায় পরিতলায়-হিংসা, ঘৃণা, স্বার্থপরতা ও স্বেচ্ছাচারিতাকে আপন করে নেয়। ভোগবাদী মানুষ তাদের সম্পদ কখনো পরার্থে ব্যয় করে না, পরের দুঃখে কাতর হয় না; বরং হীন উদ্দেশ চরিতার্থ করতে সুযোগের সন্ধান করে। মানবিকতা ও পরার্থপরতা তাদের কাছে অধীনস্থ। তাই সমাজের মানুষের কাছেও তাদের কোনো মর্যাদা থাকে না। তারা জন্মগতভাবে মানুষ হলেও তাদের মনুষ্যত্ব আসলে বিকশিত হয় না। আবার কিছু মানুষ ভোগের চেয়ে ত্যাগকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। মানুষের বিপদে তাঁরা ছুটে যান, নিজের সুবিধার কথা না ভেবে বৃহত্তর কল্যাণের কথা ভাবেন, দুঃখীজনের দুঃখ দূর করতে নিজের সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে আনন্দ পান। ভোগবাদী মানুষের ভ্রান্ত-ধারণা ভোগের মেধাই সকল সুখ। তাই তারা সম্পদের পাহাড় গড়ে বিলাস-বাসনে মত্ত হয়। তারা ভোগের মাধ্যমে সুখী হতে চায় বটে, তবে তারা প্রকৃত সুখের সন্ধান পায় না। বরং যেসব মানুষ নির্বিধায় অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকেন, তাঁদের দ্বারা সমাজ যেমন উপকৃত হয়, তাঁরা নিজেরাও এসব কাজের মধ্য দিয়ে অনাবিল আনন্দ লাভ করেন। ত্যাগের মহিমা অসীম। মনুষ্যত্ব বিকাশে ত্যাগের চর্চার কোনো বিকল্প নেই। ভোগ মনুষ্যকে লজ্জা ও হীনতায় ডুবিয়ে রাখে।

১৪।

> *যে নদী হারায়ে স্রোত চিনিতে না পারে*
> *সহর শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে;*
> *যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়*
> *পদে পদে বাধে তাঁরে জীর্ণ লোকাচার।*

ভাবসম্প্রসারণ: গতিশীলতা প্রাণের ধর্ম। যেখানে গতি নেই, চঞ্চলতা নেই, সেখানে স্থবিরতা জেঁকে বসে। ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় সকল ক্ষেত্রে স্থবিরতা যাবতীয় অর্জন ধ্বংস করে দেয়। তাই কৃতিত্ব, সাফল্য ও সমৃদ্ধির জন্য গতিশীলতার কোনো বিকল্প নেই। নদীর ধর্ম বয়ে চলা। স্রোতই তার গৌরব। স্রোত না থাকলে নদী ধীরে ধীরে মরে যায়। স্রোতের টানে বিশাল জলরাশি পাহাড় থেকে সমুদ্রের দিকে ধেয়ে চলে। এই স্রোতই নদীকে প্রাণের স্পন্দনে জাগিয়ে রাখে, দুই পাড়ে জন্ম দেয় নতুন নতুন সভ্যতার। তার গতিচাঞ্চল্যে ফুটে ওঠে জীবনের বলিষ্ঠ প্রকাশ। সব জঞ্জাল ভাসিয়ে নিয়ে সব রকমের পচিলতা থেকে নদীকে মুক্ত রাখে স্রোত। তবে কখনো যদি এই স্রোত থেমে যায়, রুদ্ধ হয় কোনো গভীর সীমায়, তবে নদী তার গৌরব হারায়। নদীর বুকে জন্ম নেয় অসংখ্য জলজ উদ্ভিদ, আবর্জনায় ঢেকে যায় টলমলে জলের ধারা। গতিচাঞ্চল্য, ছন্দময়তা আর জলকল্লোল হারিয়ে নদীটি নির্জীব হয়ে পড়ে। ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি নদীর মেতা গতিময়তায় তার প্রাণ; গতিহীনতায় তার মৃত্যু। আধুনিকতা, উন্নয়ন, অগ্রগতি, সমৃদ্ধি প্রতিটি ধারণার সঙ্গে উদাম, গতিময়তা ও পরিবর্তনশীলতার যোগ রয়েছে। কোনো ব্যক্তি বা সমাজ যদি প্রাচীনতাকে আঁকড়ে ধরে নতুন সময়ে টিকে থাকতে চায়, তবে ওই ব্যক্তি বা সমাজ নতুন সময়ের দাবিকে উপেক্ষা করে। অযৌক্তিক বিশ্বাস, মিথা ও সংকীর্ণ সংস্কার আর অচল ভাবনার নাগপাশ থেকে বেরিয়ে যে জাতি পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারে না, তারা স্রোতহীন নদীর মেতো স্থবির হয়ে পড়ে। তাতে যুক্ত হয় মিথা সংস্কারের নতুন নতুন জঞ্জাল। রুদ্ধ হয় সন্তানদার নতুন সকল দ্বার। আর যে জাতি একটি স্বাভাবিক চলনধর্ম মেনে নতুনকে স্বাগত জানায়, নিঃসংকোচে আলিঙ্গন করে নতুন সভ্যতাকে, সংস্কারের নাগপাশ ছিন্ন করে নতুন জ্ঞানকে গ্রহণ করে, সে জাতিকে কখনো স্থবিরতা পেয়ে বসে না। পরিবর্তন আর অগ্রগতির প্রধান শর্ত গতিশীলতা। সবকিছু স্থবির জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার এতখানি অগ্রসরতা ঘটতো না। যে সহে, সে রহে।

সারাংশ/সারমর্ম

২০ টি

১।

> *এ কথা নিশ্চিত যে, জনসংখ্যার উর্ধ্বগতি জাতীয় জীবনে উন্নয়নের গতিকে স্থক করে। সমাজ ও পরিবারের জীবেনও তা নানা প্রতিকুল প্রভাব ফেলে। অধিক জনসংখ্যার ভারে নুজ সমাজ তার সদস্যদের সামাজিক অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। যেমন, শিক্ষালাভের অধিকার একটি সামাজিক অধিকার। কিছু দারিদ্রাপিড়িত সমাজে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার অসাড় কঠিন। বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যা এখনও শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এই বিপুল জনসংখ্যার জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারলে দেশের অগ্রগতি স্থবির হয়ে পড়তে বাধ্য। দেশের নতুন প্রজন্মকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা মানে হলো স্বপ্নময় বিশাল জনশক্তির অপচয় ঘটানো।*

সারাংশ: জনসংখ্যার অধিক বৃদ্ধি দেশের উন্নতির অন্তরায়। এতে সমাজ ও পারিবারিক জীবনে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষ শিক্ষার মতো সামাজিক অধিকার পায় না। ফলে দেশের বিপুল জনশক্তির অপচয় ঘটে।

২।

> *শৈশবে সদুপদেশ যাহার না রোচে,*
> *জীবনে তাহার কভু মুখতা না ঘোচে।*
> *চৈত্র মাসে চাষ দিয়া না বোনে বৈশাখে,*
> *কবে সেই হৈমন্তিক ধানা পেরে থাকে?*
> *সময় ছাড়িয়া দিয়া করে পশ্চম,*
> *ফল চাহে, সেও অতি নির্বোধ, অধম।*
> *খেয়া-তরী চলে গেলে বসে এসে তীরে,*
> *কিসে পার হবে, তরী না আসিলে ফিরে?*

সারাংশ: নৈতিকতা শেখার যথার্থ সময় শৈশবকাল। ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করতে না পারলে জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এমনকি অসময়ে অতিশ্রেমেও কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা সম্ভব হয় না।

৩।

> *বিদ্যা মানুষের মূল্যবান সম্পদ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু চরিত্র তদপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান। অতএব কেবল বিদ্বান বলিয়াই কোনো লোক সমাদর লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। চরিত্রহীন ব্যক্তি যদি নানা বিদ্যায় আপনার জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াও থাকে, তথাপি তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করা শ্রেয়। প্রবাদ আছে যে, কোনো কোনো বিষধর সর্পের মস্তকে মণি থাকে। মণি মূল্যবান পদার্থ বটে। কিন্তু তাই বলিয়া যেমন মণি লাভের নিমিত্ত বিষধর সর্পের সাহচর্য করা বুদ্ধিমানের কার্য নহে, সেইরূপ বিদ্যা আদরণীয় বিষয় হইলেও বিদ্যালাভের নিমিত্ত বিদ্বান দুর্জনের নিকট গমন বিধেয় নহে।*

সারাংশ: বিদ্যা মূল্যবান বটে, তবে চরিত্রের মূল্য আরো বেশি। যার চরিত্র ভালো নয়, তার জন্য দিয়ে কোনো ভালো ফল আশা করা যায় না। সাপের মাথায় মণি থাকলেও তা ভয়ংকর; চরিত্রহীন বিদ্বান হলেও তার সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত।

৪।

> *কোথায় স্বর্গ? কোথায় নরক? কে বলে তা বহুদূর?*
> *মানুষেরই মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর!*
> *রিপুর তাড়েন যখনি মোদের বিবেক পায় গো লয়,*
> *আত্মাগ্লানির নরক-অনলে তখনি পুড়িতে হয়।*
> *প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে,*
> *স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরই কুঁড়ে ঘরে।*

সারাংশ: স্বর্গ ও নরক প্রাপ্তি যে ঘটে পরকালে এমনটাই প্রচলিত ধারণা। কিন্তু পৃথিবীতেই স্বর্গ কিংবা নরক রচনা করা সম্ভব। প্রীতি ও প্রেমেই সত্যিকার সুখ আসে; হিংসা ও কুপ্রবৃত্তি দেয় নরক-যন্ত্রণা।

৫।

> *সমাজের কাজ কেবল মানুষকে টিকে থাকার সুবিধা দেওয়া নয়, মানুষকে বড় করে তোলা, বিকশিত জীবনের জন্য মানুষের জীবনে আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়া। সঙ্গপ্রথ সৃষ্টিত্ব ও অবদনতিপ্রিয় মানুষে সংসার পরিণ্যা। তাদের কাজ নিজের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলা নয়, অপরের সার্থকতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা। প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করেনি বলে এরা নিষ্ঠুর ও বিকৃতবুদ্ধি। এদের একমাত্র দেবতা অহংকার। তারই রঙ্গে তারা নিবেদিতপ্রাণ। ব্যক্তিগত অহংকার, পারিবারিক অহংকার, জাতির অহংকার ও ধর্মগত অহংকার এ সবের লাল নিশান ওড়ানেই এদের কাজ। মাঝে মাঝে মানব-প্রেমের কথাও তারা বলে। কিন্তু তাতে নেশা ধরে না, মনে হয় তা অন্তরিকতাহীন ও উপলদ্ধিহীন বুলি মাত্র।*

সারাংশ: সমাজ একটি সামবায়িক সংগঠন। সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য মহৎ হলেও এখানে ভালো-মন্দ উভয় শ্রেণির মানুষের উপস্থিতি থাকে। অহংকারী ও স্বার্থপর মানুষ সমাজে কোনো ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে না, বরং অপ্রত্যাশিত প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।

৬।

> *এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান;*
> *জীর্ণ পৃথিবীতে বার্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে।*
> *চলে যেতে হবে আমাদের।*
> *চলে যাব – তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ*
> *প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,*
> *এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি –*
> *নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।*

সারাংশ: নতুনকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে পুরাতনকে চলে যেতে হয়। বর্তমান পৃথিবী নানা সংকটে জর্জরিত। নতুন প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে সুখকর ও বাসযোগ্য করে তোলার দায়িত্ব পুরাতন প্রজন্মের।

৭।

> *মাতৃনেহের তুলনা নাই; কিন্তু অতি মেহ অনেক সময়ে অমঙ্গল আনয়ন করে। যে মেহের উত্তাপে সন্তানের পরিপুষ্টি, তাহারই আধিক্যে সে অসহায় হইয়া পড়ে। মাতৃভেনের মমতার প্রভাবে, সপ্তাহে আপনাকে হারাইয়া অসুস্থ শক্তি মর্যাদা রুষিতে পারে না। নিয়ত মাতৃমেহের অন্তরালে অবস্থান করিয়া আত্মশক্তির সন্ধান সে পায় না- দুর্বল, অসহায় পাখিশাবকের মেতা চিরদিন মেহাতিশয়ে আপনাকে সে একান্ত নির্ভরশীল মেনে করে। ক্রমে জননীর পরম সম্পদ সন্তান অলস, ভীরু, দুর্বল ও পরিনদর্শহীন হইয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়। অন্ধ মাতৃমেহ সে কথা বলে না- দুর্বলের প্রতি সে স্থিরক্ষণ, অসহায় সন্তানের প্রতি মমতার অন্ত নাই- অলসকে সে প্রাণপাত করিয়া সেবা করে- ভীরুতার দর্শনার কাছে নিজের বিপদের সংক্রমণ হইতে তীরকে রক্ষা করিতে বাস্ত হয়।*

সারাংশ: অতিরিক্ত মাতৃমেহ সন্তানের জন্য মঙ্গলজনক নাও হতে পারে। অধিক মেহে সন্তানের মেধে নির্ভরতা আসে না; সে অসহায় হয়ে পড়ে। অন্ধ মাতৃমেহ দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেয়।

৮।

> *আসিতেছে শুভদিন,*
> *দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ!*
> *হাতুড়ি শাবল গাইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,*
> *পাহাড়-কাটা সে পথের দু'পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,*
> *তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,*
> *তোমারে বিহেত যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধুলি;*
> *তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান,*
> *তাদেরি বাঁধিত বেক্ষ পা ফেলে আসে নব উথান।*

সারাংশ: শ্রমজীবী মানুষের শ্রম ও ত্যাগ গড়ে উঠেছে মানবসভ্যতা। ধনিকশ্রেণির দ্বারা নিপীড়িত হলেও তারা সত্যিকারের মহৎ মানুষ। একদিন তাদের নবজাগরণের মধ্য দিয়ে এ বিশ্বে নতুন দিনের সূচনা ঘটবে।

৯।

> *অভ্যাস ভয়ানক জিনিস- একে হঠাৎ স্বভাব থেকে তুলে ফেলা কঠিন; মানুষ হবার সাধনাতেও তোমাকে ধীর ও সহিষ্ণু হতে হবে। সত্যবাদী হতে চাও? তাহলে ঠিক কর সপ্তাহে অন্তত একদিন তুমি মিথ্যা বলবে না। ছয় মাস ধরে এমনি করে নিজে সত্য কথা বলতে অভ্যাস কর। তারপর এক শুভ দিনে আর একবার প্রতিজ্ঞা কর, তুমি দুটি মিথ্যা বলবে না। এক বছর পরে দেখবে সত্য বলা তোমার কাছে অনেকটা সহজ হয়ে পড়েছে। সাধনা করতে করতে এমন একদিন আসবে তখন ইচ্ছা করলেও মিথ্যা বলতে পারবে না। নিজেকে মানুষ করার চেষ্টায় পাপ ও প্রবৃত্তির সেই সংগ্রামে তুমি হঠাৎ জয়ী হতে কখনও ইচ্ছা করো না। তাহলে সব পণ হবে।*

সারাংশ: মানুষ অভ্যাসের দাস। কোনো অভ্যাসকে একদিনে বদলানো যায় না। অভ্যাস বদলানোর জন্য নিয়মিত চেষ্টা করতে হয়। নিজেকে চিরত্রবান করতে ধীরে ধীরে নিয়মিত মিথ্যাচার বাগ করতে হবে।

১০।

> *বসুমতি, কেন তুমি এতই কৃপণা,*
> *কত খোঁড়াখুঁড়ি করি পাই শস্যকণা।*
> *দিতে যদি হয় দে মা, প্রসন্ন সহাস –*
> *কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস?*
> *বিনা চাষে শস্য দিলে কী তাহাতে ক্ষতি?*
> *শুনিয়া ঈষৎ হাসি কন বসুমতী,*
> *আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে,*
> *তোমার গৌরব তাহে নিতান্তই ছাড়ে।*

সারাংশ: শ্রমসাধ্য অর্জন করা কষ্টসাধ্য। তাই মানুষের শক্তি, সামর্থ্য ও শ্রমের এত মূল্য। অন্যের করুণার উপরে নির্ভরশীল হলে মানুষের মর্যাদা বাড়ে না। কষ্ট করে পাওয়া ফেলার মধ্যে মানুষের গৌরব নিহিত।

১১।

> *মহাসমুদ্রের শত বংসেরর কলোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মেতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাসাগরের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে আমা চুপ করিয়া আছে, ভাবাও স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিষ্কৃতা ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেলারে বাহির হইয়া আসে হিসালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানবহৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।*

সারাংশ: লাইব্রেরির সঙ্গে নীরব মহাসাগরের তুলনা করা যায়। যুগ যুগ ধরে অগণিত জ্ঞানী-গুণী মানুষের চিন্তা-ভাবনা বইয়ের পাতায় স্থায়িত্ব লাভ করে। মানুষের অর্জিত জ্ঞান এই বইয়ের মাধ্যমে লাইব্রেরিতে সঞ্চিত হয়ে আছে।

১২।

> *ধন্য আশা কুহকিনী! তোমার মায়ায়*
> *অসার সংসারচক্রে ঘোরে নিরবধি!*
> *দাঁড়াইত স্থিরভাবে, চলিত না হায়!*
> *মন্তবল তুমি চক্র না ঘুরাতে যদি!*
> *ভবিষ্যৎ-অন্ধ মূঢ় মানব-সকল*
> *ঘুরিতেছে কর্মফেরে বর্তুল আকার;*
> *তব ইন্দ্রজালে মুগ্ধ; পেয়ে তব বল*
> *যুঝিছে জীবন-যুদ্ধ হায়! অনিবার।*
> *নাচায় পুতুল যথা দক্ষ বাজিকরে,*
> *নাচাও তেমনি তুমি অবচীন নরে।*

সারাংশ: আশা জীবন-সংসারের অদৃশ্য চালিকাশক্তি। আশা না থাকলে মানবজীবন স্থবির ও জড়তায় পর্যবসিত হতো। আশা আছে বলেই এর মন্ত্র-মায়ায় মানুষ সামনে এগিয়ে চলে, সমুদ্রের লক্ষ্যে জীবন-যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

১৩।

> *মানুষের মূল্য কোথায়? চরিত্র, মনুষত্ব, জ্ঞান ও কর্মে। বস্তু চরিত্রবলেই মানুষের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা বুঝতে হবে। চরিত্র ছাড়া মানুষের গৌরব করার আর কিছুই নেই। মানুষের শ্রদ্ধা যদি মানুষের প্রাপ্য হয়, সে শুধু চরিত্রের জন্য। অন্য কোনো কারণে মানুষের মাথা মানুষের সামনে নত হবার দরকার নেই। জগতে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের গৌরবের মূলে এই চরিত্রশক্তি। তুমি চরিত্রবান লোক- এ কথার অর্থ এই নয় যে, তুমি লম্পট নও। তুমি সত্যবাদী, বিনয়ী এবং জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও, তুমি পরদুঃখকাতর নায়ারণ এবং মানুষের ন্যায় স্বাধীনতাপ্রিয়- চরিত্রবান মানে এই।*

সারাংশ: চরিত্র, মনুষত্ব, জ্ঞান ও কর্ম মানুষের মর্যাদা নির্ধারণ করে। চরিত্রগুণেই মানুষ অন্যের শ্রদ্ধা লাভ করতে পারে। যিনি সত্যবাদী, বিনয়ী, জ্ঞানী, পরোপকারী, নায়পরায়ণ, স্বাধীনতাপ্রিয় ও সজ্জন তিনিই চরিত্রবান।

১৪।

> *নিখিলের এত শোভা, এত রূপ, এত হাসি-গান,*
> *ছাড়িয়া মরিতে মোর কভু নাহি চাহে মন-প্রাণ*
> *এ বিশ্বের সব আমি প্রাণ দিয়ে বাসিয়াছি ভালো-*
> *আকাশ বাতাস জল, রবি-শশী, তারকার আলো।*
> *সকলেরই সাথে মোর হয়ে গেছে বহু জানা-শোনা,*
> *কত কি-যে মাখামাখি, কত কি-যে মায়া-মজ বোনা।*
> *বাতাস আমারে ঘিরে খেলা করে মোর চারিপাশ,*
> *অনেহের কত কথা কহে নিতি নীলিমা আকাশ।*
> *চাঁদের মধুর হাসি, বিশ্বমুখে পুলক চুম্বন,*
> *মিটিমিটি চেয়ে থাকা তারকার করুণ নয়ন,*
> *বসন্ত নিদাঘ-শোভা, বিকশিত কুসুমের হাসি,*
> *দিকে দিকে শুধু গান, শুধু প্রেম-ভালবাসাবাসি।*

সারাংশ: প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পৃথিবীকে অপরূপ করেছে। প্রকৃতি মানুষের মনকে পুলকিত করে; আবার প্রকৃতির প্রেমে মানুষের মন বাঁধা পড়ে। এই মায়া ত্যাগ করে কেউই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিতে চায় না।

১৫।

> *আজকাল বিজ্ঞানের দ্বারা যেসব অসাধা সাধন হইতেছে, তাহাও বহে লোকের ক্ষুদ্র চেষ্টার ফেল।*

সারাংশ: বর্তমান সভ্যতায় বিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য। বিজ্ঞানের অভাবনীয় উর্তির পিছনে রয়েছে অগণিত মানুষের নিরন্তর কর্মপ্রচেষ্টা। মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার যুগ যুগ ধরে নানা আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে এই সভ্যতা সমৃদ্ধ হয়েছে।

১৬।

> *ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,*
> *ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,*
> *আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।*
> *রক্ত আলোর মদে মাতাল তোরে*
> *আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,*
> *সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ ক'রে*
> *পুছটি তোর উড়ে তুলে নাচা।*
> *আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা।*

সারাংশ: নবীনের কর্মচঞ্চলতায় পৃথিবী নতুন রূপে সাজে। যারা পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে রাখে, তারা নতুন পরিবর্তনকে ভয় পায়। তারুণ্যের প্রাণশক্তিতে সবাইকে উজ্জীবিত হতে হবে।

১৭।

> *তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফুল ফুটে, দক্ষিণ বাতাস বহে, এ সংসার সুখের স্পর্শে শিহরিয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ কর। আবার যখন দারুণ শীতে জীবেলোক থরহরি কম্প লাগে, তখন কোথায় থাক, বাপু! যখন শ্রাবণের ধারায় আমার চালাঘের নদী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে কাক চিল ভিজিয়া গোমড়া হয়, তখন তোমার মাজা মাজা কালো কালো দুলালি ধরনের শরীরখানি কোথায় থাকে? তুমি বসন্তের কোকিল, শীত বর্ষার কেহ নও।*

সারাংশ: সুবিধাবাদীদের উপস্থিতি সুসমেসে দেখা যায়। দুঃখের দিনে তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রয়োজনের সময়ে এই সুসমের বন্ধুরা কোনো উপকারে আসে না।

১৮।

> *দৈন্য যদি আসে, আসুক, লজ্জা কিবা তাহে?*
> *মাথা উঁচু রাখিস।*
> *সুখের সাথী মুখের পানে যদি নাহি চাহে,*
> *ধৈর্য ধরে থাকিস।*
> *রুদ্ররূপে তীর দুঃখ যদি আসে নেমে,*
> *বুক ফুলিয়ে দাঁড়াস,*
> *আকাশ যদি বজ্র নিয়ে মাথায় পড়ে ভেঙে,*
> *ঊর্ধ্বে দু'হাত বাড়াস।*

সারাংশ: বিপদ ও দুঃখে কাতর হলে চলবে না। ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জীবনের কঠিন পথ অতিক্রম করতে হয়। সংগ্রাম ছাড়া জীবনে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়।

১৯।

> *অভাব আছে বলিয়া জগৎ বৈচিত্রাময় হইয়াছে। অভাব না থাকিলে জীব-সৃষ্টি বৃথা হইত। অভাব আছে বলিয়া অভাব-পূরণে এত উদ্যম, এত উদ্যোগ। সংসার অভাবক্ষেত্র বলিয়া কর্মক্ষেত্র। অভাব না থাকিলে সকলেই স্থাণু-স্থবির হইত, মনুষ্যাজীবন বিড়ম্বনাময় হইত। মহাজ্ঞানীগণ অপরের অভাব দূর করিতে সর্দা বস্ত। জগতে অভাব আছে বলিয়াই মানুষ সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছে। সেবা মানবজীবনের পরম ধর্ম। সুতরাং অভাব হইতেই সেবাধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে। আর এই সেবাধর্মের ধারাই মানুষের মনুষ্যত্বসুলভ গুণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে।*

সারাংশ: জীবনে অসম্পূর্ণতা আছে বলেই মানুষ পূর্ণতার খোঁজ করে। অভাব দূর করার জন্যই সে কর্মপ্রচেষ্টায় রত থাকে। আবার কিছু মানুষ অন্যের অভাব পূরণের মধ্য দিয়ে মহান হয়ে ওঠে।

২০।

> *তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,*
> *সাকিনা বিবির কপাল ভাঙলো,*
> *সিঁথির সিঁদুর গেল হরিদাসীর।*
> *তুমি আসবে ব'লে হে স্বাধীনতা,*
> *শহরের বুকে জলপাইয়ের রঙের ট্যাংক এলো*
> *দানবের মতো চিৎকার করতে করতে,*
> *তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,*
> *ছারাবাস, বস্তি উজাড় হলো। রিকয়েললেস রাইফেল*
> *আর মেশিনগান খই ফোটালো যত্রতত্র।*
> *তুমি আসবে ব'লে হাই হলো গ্রামের পর গ্রাম।*
> *তুমি আসবে ব'লে বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তুভিটার*
> *ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে একটানা আর্তনাদ করলো একটা কুকুর।*
> *তুমি আসবে ব'লে হে স্বাধীনতা*
> *অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিলো পিতামাতার লাশের উপর।*

সারাংশ: অনেক ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। শত্রুবাহিনীর চরম আগ্রাসন ও নির্মমতার শিকার হয়েছে নারী, শিশুসহ আপামর জনসাধারণ। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের বিনিময়ে পাওয়া এই স্বাধীনতাকে কোনো মূল্য দিয়ে মাপা যায় না।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও তার প্রতিকার

অথবা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বাংলাদেশ

ভূমিকা: বাংলাদেশ মৌসুমি বায়ুর দেশ। মৌসুমি বায়ুর জন্য বাংলাদেশে ছয়টি ঋতুর আবির্ভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই ষড়ঋতুর জন্য বাংলাদেশ পৃথিবীর অকৃত্রিম প্রাকৃতিক লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। আবার মৌসুমি বায়ুর কারণেই এই শ্যামল সুন্দরের লীলাক্ষেত্র পরিণত হয়েছে শ্মশানে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানটাই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি। আমাদের দেশের দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। তারই প্রভাবে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, টর্নেডো, সাইক্লোন বা জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা ও মহামারিতে দেশের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এদেশের মানুষের নিত্যসঙ্গী। বাংলাদেশে সাধারণত যে সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা যায়, নিচে তার বর্ণনা দেওয়া হলো—

কালবৈশাখী: বাংলাদেশে প্রায় প্রতিবছরই নানা দুর্যোগ সংঘটিত হতে থাকে। কালবৈশাখীর ফলে বাংলার বহু এলাকা বিধ্বস্ত হয়। ঝড়ের তাণ্ডবলীলায় গাছপালা, ঘরবাড়ি ভেঙে যায়। মারা যায় হাজার গোক-বাছুর, পাখপাখালি, মানুষ হয় অসহায়। কিছুদিন পূর্বে এমনই এক কালবৈশাখীর শিকার হয়েছিল মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ার জনসাধারণ। ১৯৮৯ সালে সুন্দরবন এলাকা, ১৯৯১ সালে গাজীপুর এবং ১৯৯৬ সালে টাঙ্গাইলের অনেক থানা বিধ্বস্ত হয়েছে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে। নিহত হয়েছে বহু গ্রামগুা। প্রায় প্রতিবছরই বাংলাদেশের কোনো না কোনো অঞ্চলের ওপর দিয়ে এরকম কালবৈশাখী বয়ে যায়।

বন্যা: বন্যাও বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের রূপ নিয়ে দেখা দেয়। ছোটখাট প্লাবনকে আমরা বলে থাকি বর্ষা। আর সেই প্লাবন যখন বিশাল আকার ধারণ করে তখন তাকে বন্যা বলা হয়। প্রায় প্রতিবছর বাংলাদেশে বন্যা দেখা দেয়। দেশের নিম্নাঞ্চল বন্যার পানিতে ভেসে যায়। কোনো কোনো বছর তা ভয়ংকর রূপ নেয়। ধ্বংস হয় শত শত গ্রাম। মারা যায় গরু, বাছুর, মানুষ। নষ্ট হয় হাজার হাজার একর জমির ফসল। ১৯৭৪, ১৯৮৭ সালের বন্যায় আমাদের দেশের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়েছিল। ১৯৯৮ সালের বন্যা ছিল বাংলাদেশের স্মরণকালের ভয়াবহতম বন্যা। যার ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা কঠিন হয়ে পড়েছিল। ১৯৯৮ সালের বন্যাও কম ক্ষতি হয়নি। ২০০৩ সালের বন্যাও কোনো কোনো অঞ্চলে অনেক ঘরবাড়ি এবং ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বন্যা বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

সাইক্লোন বা জলোচ্ছ্বাস: সাইক্লোন বা জলোচ্ছ্বাস বাংলাদেশের একটি উপকূলবেষ্টিত দুর্যোগ। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রায় বছরই জলোচ্ছ্বাস হয়। এক পরিসংখ্যান জানা যায়, বিগত ১৮৫ বছরে বাংলাদেশে ৫১ বার সাইক্লোন সংঘটিত হয়েছে। ১৯৭০ সালের সাইক্লোন জলোচ্ছ্বাস সবাইকে হতবাক করে দেয়। সেই ঘূর্ণিঝড় বাতাসের গতিবেগ ছিল প্রায় আড়াইশ কিলোমিটার। ১৯৮৫ সালেও বাংলাদেশের দক্ষিণের দীপাঞ্চলে হানা দেয় সর্বনাশা সাইক্লোন। সাইক্লোনের প্রচণ্ড আঘাতে উড়িচর চর এলাকা বিধ্বস্ত হয়। এই সময়ে প্রায় দেড় লাখের মতো লোক প্রাণ হারায় এবং ধ্বংস হয় জমির ফসল ও অসংখ্য ঘরবাড়ি। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে সংঘটিত হয় স্মরণকালের আরও এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস। বাংলাদেশের ১৩টি জেলার প্রায় ৪৭টি থানা বিধ্বস্ত হয়। ২০ হাজার বর্গমাইল এলাকাজুড়ে এই ঝড়ু হারিকেনের রূপ নিয়ে ২০ ফুটের বেশি উচ্চতায় জলোচ্ছ্বাস আঘাত হানে। ঐ প্রলয়ঙ্করী জলোচ্ছ্বাসে প্রায় পাঁচ লাখ লোক মারা যায়।

টর্নেডো: বাংলাদেশে প্রায় বছরই টর্নেডো বা আকস্মিক ঘূর্ণিবায়ু মারাত্মকভাবে আঘাত হানে। ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে স্মরণকালের ইতিহাসে ভয়াবহতম টর্নেডো আঘাত হানে বাংলাদেশের নেত্রকোনা জেলা ও তার আশেপাশের জেলাগুলোতে। এতে বহু প্রাণহানি ঘটে। ধ্বংস হয় অসংখ্য ঘরবাড়ি। মারা যায় হাজার হাজার গবাদিপশু।

শিলাবৃষ্টি: শিলাবৃষ্টি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর একটি। প্রায় বছরই ব্যাপক শিলাবৃষ্টি হয়। ফলে বিভিন্ন প্রকার ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বিশেষ করে ইরি ধানের মৌসুমে শিলাবৃষ্টি হলে কৃষকের দুঃখ-দুর্দশার সীমা থাকে না। ভারা অবস্থায় শিলাবৃষ্টি হলে ধানের ফলন অনেক কম হয়। ধান ভেরে হওয়ার পর শিলাবৃষ্টি হলে ধান নষ্টি হয় এবং বেরে যায়।

ভূমিকম্প: বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় প্রতিবছর ভূমিকম্প হয়। এতে কিছু পরিমাণ জনজীবন বিপর্যস্ত হয় এবং দালান কোঠা, ঘরবাড়ি ধসে যায়। অনেক সময় ধসে যাওয়া ঘরবাড়ির নিচে চাপা পড়ে মানুষ ও পশু-পাখাল প্রাণ হারায়।

নদীভাঙন: নদীভাঙন বাংলাদেশের একটি ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। দেশের অনেক এলাকা নদীভাঙনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন—পদ্মার তীরে বসবাসকারী লোকেরা নদীভাঙনের ফলে অনেক ক্ষেত্রে সর্বস্ব হারিয়ে রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়। যমুনা নদীর ভাঙনেও অনেক পরিবার সর্বহারা হচ্ছে।

খরা: খরা: কৃষিপ্রধান দেশে খরা বা অনাবৃষ্টি একটি ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশে প্রায় বছরগুলোতেই খরা বা অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। যে বছরগুলোতে খরা বা অনাবৃষ্টি দেখা দেয়, সে বছর প্রায় সবরকম ফসলেরই ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। খরা বা অনাবৃষ্টি বাংলাদেশের জন্য একটি মারাত্মক ক্ষতিকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

অতিবৃষ্টি: অতিবৃষ্টি: কৃষিপ্রধান দেশে ফসলের ক্ষতি কম নয়। বাংলাদেশে প্রায় বছরই অতিবৃষ্টির প্রকোপ দেখা দেয়। অতিবৃষ্টির ফলে ফসলের জমি পানিতে ডুবে যায়, কিংবা জমি থেকে পানি নিষ্কাশন দেরিতে হয়। এতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে।

দুর্যোগ মোকাবিলার উপায়: বিভিন্ন উপায়ে এসব দুর্যোগ মোকাবিলা করা যায়। দুর্যোগ মোকাবিলার প্রধান প্রধান উপায়গুলো নিম্নরূপ: ১. দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীবাহিনী গঠন করা। ২. জাতীয় ভিত্তিতে দুর্যোগ মোকাবিলা করার নীতিমালা, পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করা। ৩. দুর্যোগ ঘটার পর ক্ষত ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের ব্যবস্থা করা। ৪. তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থার উন্নত করা। ৫. দুর্যোগপূর্ণ এলাকার অবকাঠামোগত গড়ে তোলা।

উপসংহার: দুর্যোগ সবসময়ই মানবতার জন্য বিপদ ডেকে আনে। তাই যেকোনো দুর্যোগের সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যাওয়া মানবতার কাজ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য বাংলাদেশ সরকার অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ফলে আমরা ভবিষ্যতে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সময়োপযোগী দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণে সক্ষম হতে পারব।

ষড়ঋতুর বাংলাদেশ

ভূমিকা: ধনধান্য পুষ্পভরা এই বসুন্ধরার রঙবৈচিত্র্য পৃথিবীর আর কোথায়ও কেথা মিলে না। বাংলার প্রতিটি রূপ, রস, গন্ধ অবিরত রং বদলায়। ঋতুবৈচিত্রে বাংলার প্রকৃতি সাজে নানান সাজে। অফুরন্ত এ রূপ সর্বদা নব নব সাজে সজ্জিত হয়। সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ বৈচিত্র্যময় দেশ কখনো ভয়ংরী রূপ নেয়, কখনো বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, কখনো সজল কালো চোখ তুলে ভালোবাসার বাণ ছুড়ে দেয় প্রকৃতির সন্তানদের দিকে। কখনো কিশোরী মেয়ের মতো বাঁকা চোখে তাকায়, কখনো যৌবন রসে সিক্ত করে সবাইকে। জীবনানন্দের রূপসী বাংলার অফুরন্ত রূপ কখনো ফুরিয়ে যায় না।

গ্রীষ্ম ঋতু: ষড়ঋতুর প্রথম কুশীলব গ্রীষ্ম। ধু ধু রুক্ষ ধুলো চেখে পথর বহিঞ্জলা নিয়ে তার আবির্ভাব। সূর্যের প্রচণ্ড শাসনে ধরিত্রীর বক্ষ বিদীর্ণ। পথর সূর্যতাপে আকাশ তৃষায় কাঁপে। আদিগন্ত মরুজলের মধ্যে গ্রীষ্ম সামনে যেন একটি শামল মিষ্টি মরুদ্যান। কালবৈশাখীর রুদ্রসুন্দর মূর্তি আকাশ মাটির মেঘের উৎস মুছে নিতে আসে যা জীর্ণ ও গতায়ু, তাকে নিংড়ে বিদে দিয়ে গ্রীষ্ম নববিধানের দূর্বাঘাস আশাসারীপী যৌবন করে। বাংলাদেশের গ্রীষ্মের ডালি ভরে ওঠে রসালো আম, জাম, কাঁঠালের প্রাচুর্যে। গ্রীষ্ম ফুলের ঋতু নয়, ফুল ফোটানোর তাড়া নেই তার, শুধু ফুলের ডালা সাজিয়েই নিঃশেষে বিদায় নেয়।

নবীন বর্ষা: রূপসী বাংলার বুকে গ্রীষ্মের পর আসে শামল সরস। সজল নবীন বর্ষা। গ্রীষ্মের লেলিহান হোমশিখাকে আবৃত করে দূর দিগন্তে ধূসর আকাশের বুকে তরে তরে জমে ওঠে নবীন মেঘের তূপ। বর্ষার আগমনে বাংলাদেশের প্রকৃতিতে যে, বিপুল পরিবর্তন আসে, অন্য কোনো ঋতুতে তা দেখা যায় না। পচে প্রকৃতিতে বর্ষা নিয়ে আসে যৌবনের উচ্চামতা। অবিরাম বর্ষণে মাঠঘাট, খালবিল, নদীনালা ভরে যায়। দূর্দিন্ত থেকে দুরন্ত বায়ু ছুটে আসে হা হা। শঙ্ক। শুক হয় শীলর ধারাবর্ষণ। বহদিন পরে আবার শোনা যায় নানা মঙ্গলীয় মুখর পাখির কূজন। মাটির কঠিন শাসন ভেদ করে নবীন শস্যাঙ্কুরের দল বেরিয়ে পড়ে নবজীবনের জয়যাত্রায়। প্রকৃতির ধুলি বিষণ্ণ অঙ্গ থেকে গ্রীষ্মের ধূসর অবসাদ মুছে গিয়ে ঘনিয়ে আসে। সজল বর্ষাপ্রকৃতির পুষ্প বিকাশের পরম লগ্ন। কদম, কেয়া, জুঁই, গন্ধরাজ, হাসনাহেনার বিচিত্র বর্ণ ও গন্ধের উৎসবে বাংলার প্রকৃতির হৃদয়ের দ্বার খেলা খুলে যায়।

অমল ধবল শরৎ: বৈচিত্র্যময় রূপৈশ্বর্যের রানি বাংলার তৃতীয় ঋতু শরৎ। অমল ধবল পালে ছন্দ মধুর হাওয়া লাগিয়ে প্রকৃতিতে আবির্ভাব ঘটে শরতের। কাশফুলের ভরাতয়া প্রকৃতিতে শান্তির পরশ লাগে। শিউলি ফুলের মন উদাস করা গন্ধ মানবমনে ভালোবাসা জাগিয়ে দেয়। ভোরের শিশিরের কোমলতা নিয়ে প্রকৃতি মানবমনে সুখের পরশ বুলিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়- "আজি কী তোমার মধুর মুরতি হেরিনু শারদ প্রভাতে।"

সুমলা হেমন্ত: শরৎরানির বিদায় বার্তা ঘোষিত হতেই হিমের ঘন ঘোমটায় মুখ ঢেকে হেমন্ত এসে উপস্থিত হয়। সে যেন ফসল ফলানোর নিঃসঙ্গ সাধনায় থাকে নিমজ্ঞ। খেতখামারে রাশি রাশি ভারা ভারা সোনার ধান উঠতে থাক। চারদিকে অফুচিন কর্মব্যস্ততা।। ঘরে ঘরে শুরু হয় নবান্নের উৎসব।

হাড় কাঁপানো শীত: হেমন্তের গৌরচ্ছেদ পর আসে জরাগ্রস্ত শীতের ধূসর বার্ধক্য। শুষ্ক কাঠিন্য, পরিপূর্ণ রিক্ততা ও দিগন্তব্যাপী সুদূর বিষাদের প্রতিমূর্তি সে। বিবর্ণ কানন বীথির পাতায় পাতায় নিঃশেষে ঝরে যাওয়ার নির্মম ডাক এসে পৌঁছায়। এক সীমাহীন রিক্ততার অসহায় ডালপালাগুলো একদিন হাহাকার করে কেঁদে ওঠে। শীতের আগমনের সাথে সাথে প্রকৃতির ওপর যে শাসন ও শোষণ শুরু হয়ে যায়, তাতে প্রকৃতি তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য হারিয়ে রুগ্ন হয়ে ওঠে।

নবজীবন বসন্ত: ষড়ঋতুচক্রের সর্বশেষ ঋতু বসন্ত। শীতের তাণ্ডব সাধনা তো বসন্তের নবজন্মের প্রতীকায়ই। বসন্ত আনে নবীন প্রাণ, নবীন। উৎসাহ, নবীন উদীপনা নিয়ে যৌবনের সজীবনী রসে পরিপুষ্ট হয়ে। তার সুখময় স্পর্শে গাছে গাছে জেগে ওঠে কিশলয়। পাখির কলকাকলিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। দূর বনান্তরাল থেকে ভেসে আসা কোকিলের কুহুগীতি পৃথিবীতে সৃষ্টি করে এক অপরূপ মায়া নিকেতন। অশোক-পলাশের রাঙিন বিচ্ছলতায় ও শিমুল-কৃষ্ণচূড়ার বিপুল উদ্‌লাসে, মধুমালতী ও মাধবী মঞ্জির উচ্ছল গেকমিদার প্রণবতায় সারা আকাশতলে গন্ধ, বর্ণ ও গানের তুরুল কোলাহলে লেগে যায় এক আর্ঘ মাতামাতি। বসন্তেরে গাছে গাছে নাম ফুলে ফোটে। তাই বসন্তকে ষড়ঋতুর রাজা আখ্যায়িত করা হয়েছে।

উপসংহার: রূপসী বাংলার এই ঋতুচক্রমালা নানা বর্ণ, গন্ধ, গানের সমারোহে নিত্য আবর্তিত হয়ে চলে। ষড়ঋতুর রঙমেশে এমনি করে প্রতিটি ঋতু যুগ যুগ ধরে অবিয়ে আসে বাংলায়। একের পর এক তাদের আগমন ও অবতরণ বাঙালির প্রাণে রং ধরায়। এই ষড়ঋতুচক্রের অবদানেই আমাদের বাংলাদেশ হয়েছে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা এবং অরণ্যকুন্তলা।

একটি শীতের সকাল

ভূমিকা: ঋতুরঙ্গময়ী রূপসী বাংলাদেশ। বণ্ড প্রকৃতির ষড়ঋতুমালায় তার কী শেষময়, সংগীতময় অনুপম রূপাবিশার। ঋতু পরিবর্তনের বর্ণবিচিত্র ধারাপথে নিত্য উদাসিত হয়ে ওঠে তার অহেতু রূপের খেলা, রেশের খেলা, সুরের খেলা। ষড়ঋতুর এই খেলায় হেমন্তের গৌরচ্ছেদের পর আসে জরাগ্রস্ত শীতের ধূসর বার্ধক্য। শুষ্কতিন্য, পরিপূর্ণ রিক্ততা ও দিগন্তব্যাপী সুদূর বিষাদের প্রতিমূর্তি সে। তবু শীতের সকাল নতুন আমেজ নিয়ে হাজার প্রচাগ্রাহ্যবারি।

শীতের আগমন: পৌষ-মাঘ দুমাস শীতকাল। তার তাপিবল রূপমূর্তির মেঘা প্রচ্ছন্ন থাকে এক মহামেঘী তপস্বীর তপস্বীর এবং অনন্ত বৈরাগের ধূসর অচীকার। বিবর্ণ কাননবীথির পাতায় পাতায় নিঃশেষে ঝরে যাওয়ার নির্মম ডাক এসে পৌঁছায়। এক সীমাহীন রিক্ততায় অসহায় ডালপালাগুলো একদিন হাহাকার করে কেঁদে ওঠে। তাকে সব দিয়ে দিতে হয়, দিয়ে যেতে হয়। ওদিকে ধান কাটা মাঠে কী সীমাহীন শূন্যতা, কী বিশাল কারুণ্য।

একটি বর্ষণমুখর সন্ধ্যা

ভূমিকা: দৈনন্দিন কর্মমুখর জীবন প্রবাহের গতানুগতিকতার মধে এমন কিছু দিন ও মুহূর্ত আসে যেগুলো একটা বিশেষ সাড়া ও রসাস্বাদে আমাদের মনের নিভৃতকোঠায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে, যা সহজে ভুলা যায় না। জীবনে কত শরত, কত অনুরণ সৌন্দর্যের ডালি সাজিয়ে মনকে ভাসিয়ে দিয়ে গেছে কোনো এক কল্পনার জগতে, বর্ষা এনেছে জীবনে রোমাঞ্চ। এমনি এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যার স্মৃতি আমার স্মৃতির জগতে অক্ষয় হয়ে আছে।

বর্ষণমুখর সকালের অনুভূতি: সকাল থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মনে হচ্ছিল যেন সন্ধ্যার আঁধার এসেছে ঘনিয়ে। নিতাদিনের মেঠো খোলা জানালার পাশে বই নিয়ে পড়তে বসেছিলাম। একটু পরেই বৃষ্টি নামলো। চারদিক আরও ঘন অন্ধকার হয়ে এল। এমন বাদলা দিনে কি পড়ায় মন বসে? কোনা এক স্বপ্নপুরীর কল্পনায় মন ভেসে যেতে চায়, রঙিন স্বপ্নের মালা পেঁথে চলো। টেবে আছি দূরের কালো কালো মেঘের পানে। কবিগুরুর কন্যস্পর্শী আবেগ এদের এক অপূর্ব অনুভূতির জাগায়। 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে/ মুগ্ধের মত নাচেরে।' কতক্ষণ ধরে কী ভাবছিলাম খেয়াল নেই। হঠাৎ পাশের বাড়ির টেপ রেকর্ডার থেকে ভেসে এল মন উদাস করা রবীন্দ্রসংগীতের সুর— 'মন মোর মেঘের সনী উড়ে চলে দিক-দিগন্তের পানে নিঃসীম শূন্যে'

বর্ষণমুখর সন্ধ্যার বর্ণনা: সকাল থেকেই অবিরাম বৃষ্টি। সারাদিন পার হয়ে গেল, অথচ বৃষ্টির কমতি বেশি নেই। একইভাবে অন্তরাল বর্ষণ। মেঘের কালো ঝাঁপির মেঘ হারিয়ে গিয়েছিল দিনের সূর্য। মেঘের কালো ছায়ায়, বৃষ্টিতে, ঝড়হাওয়ায়, ঘন ঘন মেঘের গুরু গুরু ডাকে অদ্ভুত একটা মায়াবী পরিবেশ। গাছের ডাল পাতায় ঝড়োহাওয়া আর বৃষ্টির ফোঁটার চলছিল অবিরাম মাতামাতি। রুটি বাউল তার একতারা বাজিয়েই চলেছে। আকাশ অঝোর ধারায় কেঁদেই চলেছে। বৃষ্টির রিমঝিম শব্দের সংগীতে কোথাও ছেদ পড়েনি। 'ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাইরে' এমনি করে আটকে থাকার বাধাবাধকতার চার দেওয়ালের মাঝে বন্দি করে ফেলছিল মানুষকে। স্বাভাবিক জীবন হয়ে পড়েছে বিপর্যস্ত। মানুষজন সকলেই ঘরের দিকে ছাত্রপত্র রওয়ানা হয়েছে। কেউ ছাতা মাথায়, কেউ পাতার মাথায় দিয়ে, কেউবা খালি মাথায় ছুটে চলেছে। সকাল দুপুরে বেরিয়ে আসা পাগলদিপও গোপালায় ফিরেছে। পাখিরা ফিরেছে তাদের নীড়ে। কিছু কোনো বিভাবরের পাখা বহ হস নি। কবিরা বর্ষার প্রেমিক, এমনকি প্রাবন্ধিকেরাও এর থেকে পিছিয়ে নেই। আমি নিতান্তই ছাত্র। একটানা বৃষ্টি আমার কাছে মোটেই সুখকর নয়। দিনভর বৃষ্টি মানেই দুপুরে ভুনা খিচুড়ি, প্রতিশীর বাড়ি যেতে হাটু কাদা জল, পদে পদে পিচল পথের হামকি, আর সবচেয়ে নিদারুণভাবে বিকেলে খেলার মাঠে ফুটবল খেলার ইতি। অতএব, সবকিছুর আশা ছেড়ে দিয়ে আগে থেকেই জানালার পাশে বসেছিলাম। পড়ুয়া ছাত্রার বলে, বৃষ্টির দিনে নাকি অনেক কারে সুখ; সে চেষ্টাও একবার করেছিলাম। কিছু অদ্ভুত তো কেবল। মিষ্টিচেষ্টাই বাপার নয়, মনও লাগে। বৃষ্টির বেধড়ক অত্যাচারে মনটা এমনই বিরূপ হয়ে আছে যে, কোনো অঙ্কই মিলবার সম্ভাবনা দেখা গেল না। সুতরাং জানালার ধারে বসে বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ শোনা আর কারো কোনো উপায় ছিল না। বৃষ্টির জলা দৃষ্টি মেঘের প্রসারিকে রকার নাম। চেহার ঠিক স্মৃতির সামনেই সম্পক করে পানির বড় বড় ফোঁটা পড়েছে চাল গড়িয়ে। আর তার থেকে কিছু দূরেই অঝোর ধারায় সুচ্ছ জলকণার বর্ষণ। আমাকে কিছু প্রথম বাপারটাই আকৃষ্ট করল বেশি। প্রাকৃতির বর্ষণের তুলনায় এ পতনের বেশ একটা ছন্দ আছে, নির্দিষ্ট সময় অন্তর এক একটা ফোঁটার পতন। মনে প্রখলা বৃষ্টি দিনে যেতে কারো অনুভূতি ভার। দূরে গাছপালাগুলো ঝাপসা হয়ে আছে। সতেজ, সবুজ গাছগুলো কালচে, ধূসর দেখাছে, এমনকি পাশের বাড়িটাও দেখা যাচ্ছে না ভালো করে। দুএকজন লোক ছিটাছে। মাথায় টোপর, সাবধানী পথ পদক্ষেপ, বৃষ্টির পর্দার আড়ালে চেহারা চিনবার উপায় নেই কারো। বেশ হয় এসব কিছুই বর্ষণদিনের দৃশ্যাদি। কিছু আমি তা গ্রহণে এবং আস্বাদনে অক্ষম। আমার ধারে কোনো কবিম তকল দলায়মান শাখাও নেই। মনের ভেতরে তাই কবি কবি ভাব জাগল না। তবু মনিভঙ্গ পাখা মেলল কল্পনার আকাশে। যদি ফুটবল খেলা যেত মাঠে গিয়ে কিংবা হা-ডু-ডু। সূর্যের মুখ দেখা যায় না সারাদিন। পুরো দিনটাতেই ছিল সন্ধ্যার আদেশ। ধীরে ধীরে বৃষ্টির ফোঁটা মিলিয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে থেকে। কেবল শব্দ শোনা যেতে লাগল একটানা জল পতনের। সন্ধ্যার অবসান হচ্ছে। পাশের ডোবা থেকে ব্যাঙের প্রমত ডাক শোনা যাচ্ছে। সে যেন এক কনসার্ট। দূরে দেওয়ালে একটা কোনাকিছু জুলে উঠে। কিন্তু বৃষ্টির দিনে তো জলানিক জুলে না। ওহ, লণ্ঠন হাতে কে যেন গেলানো। গন্ধ বাঁধছে। যারা বাইরে ছিল তারা সকলেই ভেজা দেহে ঘরের অভিমুখে ফিরছে। সমস্ত আকাশ জুড়ে এমনি কালো মেঘ যেন এক্ষুণি একটা ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হবে। বর্ষণচলা আরও বাড়ে। সেই সঙ্গে বিদ্যুতের আলোকে যেন ত্রিনয়নের আগুন জুলে ওঠেছে। সেই সঙ্গে হাওয়ার তীব্র গতিতে গাছপালাদের উন্মত্ততাকিনি, এমনকি বাড়িতাও যেন কেঁপে ওঠল। প্রচণ্ড জোরের বাজ পড়ার শব্দে আতঙ্কিত নৃত্য শুরু হলো। ঝড় থেমেছে কিছু তখনো বৃষ্টি পড়েছে অবিরাম। বিদ্যুতের চোখ ধাঁধানো। আলোর ঝিলিক, গুর গুর মেঘের গর্জন, চারদিকে বিং বিং পেঁকার ডাক। মন মুচ্ছরা এই এক মোহময় পরিবেশ। এহেন বর্ষণমুখর দিনের অনুভবের আস্বাদ প্রাণ ভরে গ্রহণ করা, যায় মনের মণিকোঠায়, স্মৃতির রাশারে 'রবীন্দ্রীয় ভাষে রেখে রাখা যায়, কিন্তু সরপটিকে ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। কবির ভাষায় 'এমন দিনে তারে বলা যায়/এমন ঘন ঘোর বারিষায়।'

উপসংহার: বর্ষণমুখর সন্ধ্যার একটা নিজস্ব রূপ আছে। তা একান্তে অনুভব। না করলে তার মহিমা বোঝা যায় না। হৃদয়ের বেদনা, স্মৃতিমুখর সন্ধ্যার বুক ভরে জেগে থাকে। হঠাৎ এক অনির্বাণ আনন্দে ভরে যায়। নিরলই বাকল হয়ে শাখায় সুবাস ছড়ায়; একটা অলস অবলতা মনের গভীরে না পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। সে যে কী অনুভূতি, কী যন্ত্রণা বলে বোঝানো যায় না— 'কী জানি কী হলো আজি, উরে জাগিয়া উঠেছে প্রাণ, উঠিলি উঠেছে বারি'র মেতো।

বর্ষা ও বন্যা

অথবা, বর্ষায় বাংলাদেশ

ভূমিকা: বাংলাদেশে বর্ষার আবির্ভাব যেমন রাজসিক, তার আয়োজন তেমনি সুবিপুল। কাজল কালো সজল মেঘের স্তরবিন্যাসে আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত হয়ে যায় অবগুণ্ঠিত। ঋতুরঙ্গের পট বদলে যায়। মেঘের গর্জনে ধনিত হয় মুদের বাদা, ভেলায়ারের মেতই খরনীর বিদ্যুৎশিখা আকাশের বক্ষদেশ বিদীর্ণ করে ঝলসে ওঠে, রাজার মেতাই মহিমা নিয়ে আসে বর্ষা। এ সময়ে বলারও হয়। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও জনসংখ্যা বিস্ফোরণ যেমন বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য, তেমনি প্রতিবছর বন্যাকবলিত হওয়াও বাংলাদেশের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্ষার আগমন: আষাঢ়-শ্রাবণ মাস বর্ষাকাল। তবে বৈশাখ-জৈষ্ঠ মাস থেকেই বাংলাদেশে বর্ষা শুরু হয়ে যায়। আকাশের দিগন্তে মেঘের সমারোহ মাঝেমাঝেই দেখা যায়। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বর্ষা যখন আসে, তখন কেবল আমাদের বাইরের আকাশটাই নয়, আমাদের মনের আকাশটাকেও সে তার মেঘমাধুর্যে পরিপূর্ণ করে আনে, অবিশ্রান্ত রব বর্ষণে তাকে কোমল ও সিক্ত করে তোলে।

বর্ষার রূপ: বর্ষার আগমনে পিছু শীতল ধারাবর্ণে রোমার আগে ধরিত্রীর সর্বাঙে। উদ্ভাবছ অবেলায় প্রতীকের বুকে জেগে ওঠে বহু প্রতীতি। মর্মর মুখর মেঘালাসে। অপদ্ধতা পৃথিবীর সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটে। মাঠঘাট, নদীনালা, খালবিল পূর্ণ হয়ে ওঠে কানায় কানায়। ধূলিধূসর পৃথিবীর ধরতাং দিনের হয় অবসান। নদীপথে মাঝিমাল্লাদের কণ্ঠ থেকে শোনা যায় সারিগানের অপূর্ব উল্লাস। ছিন্ন হয় মাটির কঠিন বাধা। শস্য শিশুর দল নবঅঙ্কুরের জয়পতাকা বহন করে ধরাপৃষ্ঠে হয় অবতীর্ণ। চারিদিক শ্যামল সৌন্দর্যে প্লাবিত। তার মধ্য ঘিনিয়ে আসে পুষ্পবিকাশের আনন্দময় পরম দায়। কোয়া-কদম-দুই-গন্ধরাজ-হাসেনার মিষ্ণ গন্ধবাহে, জলের কলোচ্ছ্বাসে, বনের প্রাণরমের বর্ষাকৃতির উন্মুখ হৃদয়ের কী অনবদ্য প্রকাশ।

বর্ষার নানা দিক: সজল শ্যামল বর্ষার সঙ্গে আছে বাঙালির প্রাণের সম্পর্ক। তার সারা বছরের খাদ্য উৎপাদনে, তার অর্থনৈতিক জীবন সংগঠনে বর্ষার অবদান অসামান্য। কর্দমাক্ত গ্রাম্য পথ, পঙ্কিল মাঠে কাদা জলের খেলা, অবিরল ধারাবর্ষণ, বজ্র বিদ্যুৎ ও ঝড় বন্যার ভয়াল রূপ- সবকিছুকে তুচ্ছ করে বাংলাদেশের আবহমানকালের কৃষক সম্প্রদায় ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে এ সময় মাঠে মাঠে বীজ বোনে, চারাগাছ তোলে, চারাগাছ রোপণ করে। হেমন্তের পরিপূর্ণ খামার যে অনির্বচনীয় রাশি রাশি সোনার ধান তোলা হবে, তার জন্য বর্ষার এই দুরহ কৃষি সাধনা। মেহময়ী বর্ষাই বাংলাদেশকে করেছে শস্যশ্যামলা।

বন্যা: বন্যা বাংলাদেশের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও জনসংখ্যা বিস্ফোরণ যেমন বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য ঠিক তেমনই প্রতিবছর বন্যাকবলিত হওয়াও বাংলাদেশের একটি বৈশিষ্ট্য। কখনো কখনো অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে জলপ্লাবিত দেখা দেয়, সকে সকে নদী-নদীতেও প্লাবন আসে। বর্ষা আর প্লাবনের এই অস্বাভাবিক অবস্থাই বন্যা। প্রতিবছর খালবিল, নদীনালা, পুকুর-ডোবা প্লাবিত হয়ে গ্রামের পর গ্রাম ডুবে যায়। এ সমস্যা দূর করতে না পারলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

বন্যার কারণসমূহ: বাংলাদেশের প্রধান তিনটি নদী মেঘনা, যমুনা ও পদ্মার উৎপিণ্ডুল ভারত। মূলত এ তিন নদীর পানি প্রবাহের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধির ওপরই বাংলাদেশের বন্যা নির্ভরশীল। এছাড়া বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টিপাত ও হিমালয়ের বরফগলা পানির আধিক্য বাংলাদেশে বন্যা সৃষ্টির অন্যতম কারণ। বাংলাদেশের ভূমির উপর থেকে ঢাকুপ ঢালু পরিমাণ শুধু নয় বরং বাংলাদেশ গড় সমুদ্রতটের তুলনায় মাত্র ৪ মিটার উঁচুতে অবস্থিত, তাই এখানকার নদীগুলোর পলি বহন ক্ষমতা খুবই কম। ফলে প্রতিবছর নদীতেই পলি জমাট হয়ে নদীর গভীরতা কমে যায়। ক্রমবর্ধমান মানুষ সমস্ত নিচু জায়গা ভরাট করে তাতে তৈরি করেছে শহর, নগর ও নতুন নতুন ঘরবাড়ি। ফলে পানিপ্রবাহের অনেক পথ বন্ধ হয়ে গেছে। তাই প্রকৃতিও এর প্রতিশোধ নিচ্ছে বন্যার সৃষ্টি করে। যে বন্যা ছিল স্বাভাবিক, সে বন্যা এখন হয়ে পড়েছে অস্বাভাবিক, নিষ্ঠুর ও নিয়ন্ত্রণাতীত।

বন্যার সুট অসুবিধাসমূহ: বন্যা যে আমাদের কত ভয়াবহ অসুবিধাসমূহ সৃষ্টি করে তা কেবল ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। ভুক্তভোগী ছাড়া বন্যার করুণ কথা অনুভব করা যায় না। বন্যা যখন তার স্বাভাবিক মাত্রা অতিক্রম করে মাত্র তখন তার প্রতিক্রিয়া হয় খুবই মারাত্মক। অনির্বচনীয় ক্ষতি ফলশ্রুতি, ঘরবাড়ি তলিয়ে যায়। অনাহারে মানুষ মরে এবং বন্যা-পরবর্তী সময়ে ছড়িয়ে পড়ে রোগব্যাধি, কখনো তা এমন মহামারির আকারে দেখা দেয় যে, মানুষ তখন মানবেতর জীবনযাপন করে।

বন্যার সমস্যার সমাধান: বন্যার সমস্যার পুরোপুরি সমাধান অবশ্য ভাবে সম্ভব নয়; তবে এর ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার জন্য বেশকিছু নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। যেমন- ১. যেসব স্থানে বন্যার পানি ৩ থেকে ৫ ফুটের মধ্যে অবস্থান করে সেসব স্থানে ঘরবাড়ি, বসতি স্থাপন না করে সেখানে প্রতিবছর বন্যার স্বাভাবিক প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হলে। তাহলে পানির স্বাভাবিক প্রবাহকে স্থান দেওয়া হবে। ২. বর্ষা মৌসুমের বাড়তি পানিসহ নদীনালা, খালবিল, শাখানদী ইত্যাদির রক্ষা দিয়ে প্রবাহিত হয় সেগুলোর নিষ্কাশন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। কারণ এভাবে বর্ষার অতিরিক্ত পানিকে চারদিকে ছড়িয়ে প্রবাহিত করে বন্যা সমস্যার কিছুটা সমাধান করা যেতে পারে। ৩. নদীর উপকানা পানি যাতে তীরবর্তী এলাকায় উপচে পড়তে না পারে সেজন্য স্থানবিশেষে মাটি, পাথর, সিমেন্ট ইত্যাদি ব্যবহার করে সাধারণ বাঁধ নির্মাণের বিষয়েও ভেবেছেন দেখানো করা যায়। ৪. প্রাকৃতিক কারণে আমাদের দেশের অধিকাংশ নদ-নদী ভরাট হয়ে নাব্যতা হারিয়ে ফেলা। তাতে বন্যার পানি নদীপথে সাগরে যেতে পারে না। প্রয়োজনীয় খালখনন কর্মসূচি সম্পন্ন করা গেলে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। আর তাহলে বন্যার সমস্যা থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে।

উপসংহার: বর্ষা বাংলাদেশের জন্য আশীর্বাদ বয়ে আনলেও বন্যা কিন্তু অভিশাপস্বরূপ। তাই বর্ষা আমাদের কাম্য হলেও বন্যা মোটেই কাম্য নয়। বাংলাদেশকে রক্ষা করতে হলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বন্যার প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

একটি ঝড়ের রাত

ভূমিকা: বাংলাদেশের ষড়ঋতুর মধ্যে গ্রীষ্ম সবচেয়ে খরতাপের ঋতু। ভয়ঙ্কর ঋতু। গ্রীষ্ম দিয়ে আমাদের ঋতুচক্রের যাত্রা শুরু হয়। শেষ ঋতু রোমান্টিক বসন্তের পর থামথার গ্রীষ্মের আগমন ঘটে। এ সময়ে নদীনালা, খালবিল, পুকুর ডোবায় তেমন একটা পানি থাকে না। মাঠ ঘাট প্রান্তর খেঁচুয়ে মাটি ফেটে হা-কের থাকে। চারদিকে শুধু ধুলি আর ধুলি। রসহীন রৌদ্রের সুতীব্র উত্তাপে মাথার মগজ গলে যেতে চায়। শুনু পায়ে মেঠো পথে হাটা যায় না। গ্রীষ্মের প্রথম মাস বৈশাখ, কালৈবশাখীর মাস। ঝড় তুফানের তাণ্ডবলীলা শুরু হয় এ মাস থেকে।

ঝড়ের পূর্বাভাস: বৈশাখ মাস। ভোর থেকেই কেমন যেন এক ধরনের গুমট ভাব ছিল আকাশে। দুপুর বেলার গরমটা একেবারে অসহ্য লাগল। প্রবল বেগে বাতাস বইছে-তবু গরমের দাপটে ঘরে থাকা যায় না। ঘাম ঝরছে অবিরাম। বারবার ঘাম মুছতে হচ্ছে। দুপুর শেষ হয়ে এল। দুপুরের

আবহাওয়ার পরিবর্তন: ক্রমে ক্রমে অন্ধকার হয়ে এল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে শুরু করল। আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটল। হঠাৎ করে প্রবল বেগে শো শো শব্দে বাতাস বইতে শুরু করল। এতক্ষণ ঘরে যে বিচেরিতার শব্দ বেজেছে গর্জন চলিছিল-তেও গেল। কেমন একটা গুম গুম ভাব। সরার মনে আতেঙ্কর সৃষ্টি হলো। পথচারীরা ছুল ঘরে, পাথর পাশে যে বাড়িতে যে পারল আশ্রয় নিল। শুকনো পাতা ও খড়কুটো শুনে উড়তে লাগল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকানিতে এমন দৃশ্য কারো চোখ এড়িয়ে গেল না। সামনে যা কিছু পড়ল তাতেই বাতাস এসে আঘাত করল। ভাড়াং মড়াং শব্দে কোনো কোনো গাছের ডাল ভাঙল, কোনোটার ফলমূল ছিঁড়েবিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ল, কোনোটা আবার ছিঁমূল হয়ে মাটিতে গিয়ে পড়ল।

লোকালয়ের অবস্থা: লোকালয়ের অবস্থাও ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। কোনো ঘরের চাল উড়ে গেল, বেড়া পড়ে গেল, কোনোটা আবার মটমট শব্দ করে ধুলিসাৎ হলো। গরুছাগলগুলো গোয়ালের এক কোণে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল। কোনো কোনো গোয়ালের চাল উড়ে গেল। বিদ্যুতের চমকানিতে দেখা গেল গার্ডেনের করণ দৃশ্য। মানুষেরা আয়ার্নের বাধী চিৎকার দিয়ে আওড়াতে লাগল। নানা দিয়া কোলাম পড়তে লাগল। কালবৈশাখীর প্রচণ্ড আঘাতে ঘর ভেঙে পড়বে ভেবে কেউবা নিজের দুর্বল ঘর ছেড়ে অন্য কোথাও আশ্রয় নিল। কেউবা আঘাত থেকে কাতর আতঙ্কাদ করে লাগল। মুষলধারে শুরু হলো বৃষ্টি। শুরু হলো বেজের গর্জন। পরিস্থিতি এতই ভয়াবহ রূপ ধারণ করল যে, আর বুঝি রক্ষা পাওয়া যাবে না।

গভীর রাতের অবস্থা: বৃষ্টি এবং ঝড়ের গতিবেগ আরও বাড়ল। গুড়ুম গুড়ুম বেজের গর্জন, মড়াং মড়াং শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। বৃষ্টি আর দমকা বাতাসের দাপটে বেড়ার ফুটো দিয়ে পানি এসে আমাদের ঘরের মেঝে ভোবার মতো হয়ে গেল। হঠাৎ পদর্দায় ঠকঠক শব্দ শুনে খিল খোলামাত্র ছত্রমুড় করে ঘরে ঢুকলেন বড় চাচি এবং তাদের ছেলেমেয়েরা। তাদের ঘরের চাল উড়ে কোথায় গেছে বলতে পারেন না। এমনিভাবে ভয়াকর প্রায় নৃত্য চলল মাঝরাত পর্যন্ত।

ঝড়ের পরের দৃশ্য: ভোর হলো। বৃষ্টি থামল। গৃহস্থরা দা বটি হাতে নিয়ে ঘরের বাইরে বের হয়ে এল। রাস্তায় বহু গাছ ভেঙে পড়ে আছে। ঘরের চাল, বেড়া পড়ে আছে। গাছের ডাল কেটে, ঘরের চাল, বেড়া সরিয়ে পথ পরিষ্কারের কাজ শুরু হলো। গৃহস্থরা প্রথমেই গোয়ালের পথ পরিষ্কার করে নিল। কোনো কোনো গোয়াল ঘর কাত হয়ে আছে, কোকাটো মুড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেছে। কারও কারও গোয়াল থেকে বৃষ্টি ছিঁড়ে গরুগুলো কোথায় পালিয়ে গেছে। পথেঘাটে মাঠে ময়দানে কত পাখি মরে ও আধমরা হয়ে পড়ে আছে তার কোনো হিসাব নেই। ডিমসহ পড়ে আছে অসংখ্য বাবুই পাখির বাসা। রাশি রাশি আম পেড়ে গাছতলা ভরে আছে। ঘরদোর ও গরুবাছুরের দুর্দশার কারণে ওদিকে কারও মনোযোগ নেই। এ মনে ঝড়ের কালবৈশাখীর রাত আগে আমি মনে করতে পারি নি।

উপসংহার: প্রকৃতির রুদ্রদেবের কাছে আমরা অসহায়। বৈশাখ মাস এলে প্রতিবছরই কালবৈশাখী হয়। কোনো কোনো অঞ্চলে ভয়াবহ এবং কোনো কোনো অঞ্চলে ছোট ধরনের ঝড় হয়। কিন্তু ঝড় থেকে রেহাই পাই না বাংলাদেশের মানুষ। প্রকৃতির এই তাণ্ডবলীলা মোকাবেলা করেই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে।

শৃঙ্খলা বা নিয়মানুবর্তিতা

অথবা, মানবজীবনে শৃঙ্খলাবোধের প্রয়োজনীয়তা

ভূমিকা: সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি এক অদৃশ্য নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন। সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহ থেকে পৃথিবীর গাছপালা, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট ও কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলায় নিয়ন্ত্রিত। কোথাও এর সামান্যতম বিচ্যুতি বা বিপর্যয় নেই। স্মার্ট নেপোলিয়নের ভাষায় বলা যায়, "Discipline is the key stone to success which is compulsory to follow to balance the মানবজীবনেও প্রয়োজন সেই কঠোর নিয়মের শাসন। মানুষের জীবনকে সুন্দর করে তুলতে হলে তার জীবনে শৃঙ্খলাবোধ বা নিয়মানুবর্তিতার দরকার। কারণ শৃঙ্খলাই সৌন্দর্য ও জাতীয় উন্নতির উপায়।

জীবনে শৃঙ্খলাবোধের প্রয়োজনীয়তা: শৈশবকালই মানবজীবন প্রবেশের সিংহদ্বার। কাজেই শৈশবের শুভলগ্নেই নিয়মানুশীলনের শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। মানবজীবনে সোনা ফলাতে হলে চাই নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধের বিষয়ে অনুশীলন। কঠিন নিয়মের বাঁধনে বাঁধতে না পারলে পরিবারে ভাঙন ধরে, সমাজ টেকে না, রাষ্ট্র বিপর্যস্ত হয়, প্রতিষ্ঠান অচল হয়ে পড়ে। সভ্যতা যতই প্রসার লাভকরেছে, মানুষের সামাজিক আচরণবিধি ততই বিশিষ্ট রূপ পেয়েছে।। অসভ্য, অর্ধসভ্য এবং সুসভ্য সমাজের চেহারাটি সঠিক চিনে নিতে পারা যায় সে সমাজের নিয়ম-শৃঙ্খলা লক্ষ করে। জনগোষ্ঠীর সুশৃঙ্খল কার্যক্রম তার উন্নত সভ্যতার পরিচয় বহন করে।

শৃঙ্খলার শ্রেণিবিভাগ: জীবনে শৃঙ্খলাবোধকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। দেহগঠনে শৃঙ্খলাবোধ এবং মনোগঠনে শৃঙ্খলাবোধ। সুষ্ঠু জীবনে দুটিই সবার কাম্য। এই সুষ্ঠুতার জন্য আমাদের আহার, নিদ্রা, দৈহিক শ্রম ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত। আমাদের দেহ অভ্যন্তরীণ আর্থিক প্রক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত। তাই আমাদের দেহকে সুস্থ রাখার জন্য কাজকর্ম, আহার ও নিদ্রার মধ্যে শৃঙ্খলা বা নিয়মানুবর্তিতা একান্ত প্রয়োজন। মনোগঠনের দিক থেকে আমাদের জীবনে শৃঙ্খলাবোধের প্রয়োজনীয়তা কম নয়। মানুষ হিসেবে আমাদের নিজেদের প্রতি শুধু নয়, পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি এবং রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ববোধ আছে। এ দায়িত্ব হচ্ছে মানবিক। এই দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মনের বিকাশ দরকার।

সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলা: প্রতিটি কর্মনিশীলনের আছে একটি বিশেষ ধারাক্রম, যার নাম ছন্দ। সেই ছন্দই শৃঙ্খলা বা নিয়মানুবর্তিতা, সেই ছন্দই সাফল্যের চাবিকাঠি। শৈশব থেকে মানুষকে সমাজে বিচরণ করতে হয়, গ্রহণ করতে হয় নানা সামাজিক দায়িত্ব। কিন্তু সমাজের প্রতিটি মানুষ যদি খেয়ালখুশিমতো যথেচ্ছাচার শুরু করে, তাহলে সমগ্র সমাজটাই উচ্ছৃঙ্খলতার উথালাগালে পরিণত হবে। তাই সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলাবিধান অপরিহার্য।

পারিবারিক জীবনে শৃঙ্খলা: পরিবার সমাজের এক একটি ক্ষুদ্র পড়তি। পারিবারিক শৃঙ্খলা বা নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে দিয়ে সামাজিক শৃঙ্খলা আসে। তাই পরিবারের সদস্য হিসেবে প্রতিটি মানুষের উচিত পারিবারিক নীতিকে গুরুত্ব দেওয়া, যা মানুষের জীবনে সামগ্রিকভাবে শৃঙ্খলা এনে দেয়।

ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলা: ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বলা যায়, ছাত্রজীবনই নীতিচেতনা-নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ অনুশীলনের প্রকৃত সময়। ছাত্রজীবনই জীবন গঠনের, পরবর্তীকালে যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠার প্রকৃত সময়কাল। সৈনাদলের মতো ছাত্রদেরও মেনে চলতে হবে নিয়ম ও শৃঙ্খলা। নিয়ম-শৃঙ্খলা গড়ে তোলার কারণেই সৈনাদলকে তাদের জয়ের সম্মুখীন করে; সুখীন করে; নিয়মনিষ্ঠা এবং শৃঙ্খলাবোধ এভাবেই ছাত্রদেরও জয়ী করে, জীবনে সার্থকতা এনে দেয়। অধ্যাপনকেই পাঠ ও গঠনেকেও প্রাত্যহিক জীবনচর্চায় শ্রদ্ধাবোধ ও নিয়ম-শৃঙ্খলা কঠোরভাবে অনুশীলন করতে হবে। সব ছাত্র হয়তো মেধাবী নয়, অর্থ সামর্থও সবার বেশি থাকে না, কিন্তু তারা যদি নিয়মনিষ্ঠ জীবনযাপন করে, শিক্ষাক্ষেত্রে যদি উপযুক্ত শৃঙ্খলা মেনে চলে, জীবনযাপনেও যদি তার প্রয়োগ ঘটায়; তবে সেসব ছাত্র ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠ নাগরিক, শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিকরূপে গড়ে উঠতে পারে।

শৃঙ্খলা ও মালকসমাজের উন্নতি: মানবসভ্যতার বর্তমান চরম বিকাশের মূলেও আছে মানুষের সুশৃঙ্খল ও সুসংহত কর্মোদ্যোগ। যেখানে শৃঙ্খলা নেই সেখানে শ্রী নেই, কল্যাণ নেই, আনন্দ নেই শান্তি নেই। সেই নিরানন্দ, কল্যাণহীন, শ্রীহীন, সুষমাহীন অশান্ত অরাজকতায় ঘিরে আসে মানবজীবনের অতলমগ্ন। শৃঙ্খলাবদ্ধ, নিয়মানুবর্তী, সুসংহত সেনাবাহিনীই যুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে পারে। তাই তো শৃঙ্খল জাতির ভাগে জোটে সাফল্যের সারটিকা। এবং উচ্ছৃঙ্খল জাতির ভাগে জোটে পরাজয়ের দুঃখ গ্লানি।। আমাদের অর্থনৈতিক জীবনকেও সুষ্ঠুভাবে চালনার জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক শৃঙ্খলাবোধ। পরিমিত ব্যয় এবং আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা না থাকলে শৃঙ্খলাবোধহীন বেহিসাবি মানুষ জীবনে নানা দুঃখ- দুর্দশার সম্মুখীন হয়।

শৃঙ্খলার গুরুত্ব: বাণিজ্যিক, দৈহিক, নৈতিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সর্বক্ষেত্রে উন্নতির জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন আবশ্যক। স্বাস্থ্য রক্ষায় নিয়মভঙ্গ করলে দেহ রোগাক্রান্ত হতে বাধ্য। আত্মসংযমে অসমর্থ হলে মানুষ ইচ্ছেদের দাস হয়ে পড়বেই। এর ফলে নৈতিক চরিত্রের অধবতি অনিবার্য। বিক্ষিপ্ত মনকে যদি শৃঙ্খলার শাসনে বাঁধতে না পারা যায়, তবে বিদ্যাচর্চা করা কীভাবে সম্ভব? কাজেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বা নিয়মানুবর্তিতার চর্চা করতে হবে। জীবনে না মানলে সুন্দর জীবন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কল্যাণমুখী সুন্দর জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বা নিয়মানুবর্তিতার গুরুত্ব অপরিসীম।

উপসংহার: মানুষ হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের জীবনে যথাযথ শৃঙ্খলাবোধ থাকা প্রয়োজন। শৃঙ্খলাহীন জীবন হালছাড়া নৌকার মতো। যাকে বলে নীতিহীন জীবন। শৃঙ্খলাবোধের মাধ্যমে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেই শুধু নয়, জাতীয় জীবনে তথা সমগ্র মানবজাতির ক্ষেত্রে লাভবান হতে পারব, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কবি বলেছেন— "নিয়মের পথ ধরে গড়রে জীবন/সফলতা নিয়ে আসে সুখের স্বপন। গুণাবলি ফুটে ওঠে ছড়ায়ে যে খাঁটি/কত না সুনাম পায় দেশ আর জাতি।"

স্বদেশপ্রেম

অথবা, দেশপ্রেম

ভূমিকা: যে দেশ আলো দিল, মুখে দিল অমৃতল, দিল পরনের বস্ত্র, তার প্রতি যদি সেই দেশের শামলেনেহে প্রতিপালিত সন্তানের ভালোবাসা না থাকে, তবে তারা কেবল অকৃতজ্ঞই নয়- অধম স্বদেশের মানুষ, স্বদেশের রূপ-প্রকৃতি, তার পশুপাখি, প্রিতিটি ধূলিকণা তার সন্তানের কাছে প্রিয়, পরম পবিত্র। দেশমাতৃকার মৃণ্ময়ী মূর্তি কেবল কাদা-মাটি-জলে নির্মিত প্রতিমা মাত্রই নয়, হৃদয়ের নিবিড় ভালোবাসায় এবং গভীর মমত্ববোধে সে সন্তানের অন্তরের অন্তস্তলে পরিগ্রহ করে চির আরাধ্য চিন্ময়ী মূর্তি। স্বদেশের কাছে মানুষ সব দিক দিয়েই ঋণী। স্বদেশপ্রেম সেই ঋণ স্বীকার ও ঋণ শোধের উপায়মাত্র।

স্বদেশপ্রেম: যে ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং বড় হয়ে ওঠে; তার প্রতি, সেখানকার মানুষের প্রতি তার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ গড়ে ওঠে। স্বদেশের পশুপাখি, তরুলতা থেকে কক্ষ তার প্রিতিটি ধূলিকণা পর্যন্ত তার পরম কামনার ধন। সে তখন আবেগবিহ্বল কণ্ঠে গেয়ে ওঠে- "আমার এই দেশেতেই জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি।" দেশের প্রতি এই আজন্ম আকর্ষণ থেকেই স্বদেশপ্রেমের উন্মেষ। স্বদেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ স্বদেশপ্রেম মানুষের অন্তরে কখনো থাকে সুপ্ত, কখনো জাগ্রত। স্বদেশপ্রেম সকলের মধ্যে বাসু থাকে। ঐকাবদ্ধভাবে যখন দেশের সব মানুষ একই জীবনধারায়, একই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারায় হয়ে একই আদর্শের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে, তখনই মৃণ্ময়ী দেশ হয়ে ওঠে চিন্ময়ী। 'ফুলে ও ফসলে, কাদা-মাটি-জলে' দেশ তখন যথার্থ, মাতৃভূমি হয়ে ওঠে।

স্বদেশপ্রেমের স্বরূপ: দেশপ্রেমের উদ্ভব আত্মসম্মানবোধ থেকে। যে জাতির আত্মসম্মানবোধ যত প্রখর, সে জাতির স্বদেশপ্রেম তত গভীর। স্বদেশপ্রেম এক প্রকার পরিতৃপ্ত ভালোবেণা। নিঃস্বার্থ, হিংসাবিহীন দেশপ্রেমই প্রকৃত স্বদেশপ্রেম। ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডি অতিক্রম করে বৃহত্তর স্বার্থের দিকে যখন মন পরিচালিত হয়, যখন আত্মকলাণের চেয়ে বৃহত্তর কল্যাণবোধ সক্রিয় হয়ে ওঠে, তখনই জ্বলে ওঠে স্বদেশপ্রেমের নিষ্কলুষ প্রদীপশিখা। স্বদেশের মান-মর্যাদা এবং তার গৌরব রক্ষাকল্পে শহিদ হয়েছে কত অমর প্রাণ। দেশসেবার পথে বাধা বিস্তর, অত্যাচার সীমাহীন। পরদেশী শাসকের রক্তচক্ষু, উদ্যত অস্ত্র কিংবা পথের কোনো বাধা তাদের বিনাশপদদদপদ থেকে নিবৃত করতে পারে না। তারা মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে এগিয়ে যায় দেশমাতৃকার ভালোবাসার টানে। তাই কবি রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন-

স্বদেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত: স্বদেশকে ভালোবাসতে গিয়ে যুগে যুগে বহু নেতা ও মনীষী নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। উপমহাদেশের তিতুমীর, রানা প্রতাপ, শিবাজী, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, সূর্যসেন, প্রীতিলতা, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়ে দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। বাংলাদেশে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশে মো. রফুল আমিন, মতিউর রহমান, মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর, মোস্তফা কামাল, মুন্সী আবদুর রব, নূর মোহাম্মদ শেখ, হামিদুর রহমান প্রমুখ একাত্তরে জীবন দিয়ে দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত হিসেবে অমর হয়ে আছেন। এছাড়া শেরেবাংলা এ.কে. ফজলুল হক, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, জওহরলাল নেহেরু, ইন্দিরা গান্ধী, ড. ই. লেনিন, মাও সেতুং, গ্যারিবল্ডি, জর্জ ওয়াশিংটন প্রমুখ দেশপ্রেমের উজ্জল দৃষ্টান্ত।

স্বদেশ ও বিশ্বপ্রেম: স্বদেশপ্রেমের সাথে বিশ্বপ্রেমের কোনো অমিল নেই, কোনো সংঘাত নেই। স্বদেশপ্রেম তো বিশ্বপ্রেমেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। বলাবাহুল্য, স্বদেশ বিশ্বেরই অন্তর্ভুক্ত। স্বদেশের বধ্যস্থান বৃহত্তর পরিসরে বিশ্ব আমাদের পরিচয় দেয়। স্বদেশপ্রেমের অভিপ্রায়কে অতিক্রম করে আমরা বিশ্বপ্রেমের জগতে উপনীত হতে পারি। স্বদেশবাসীকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসতে পারলে আমরা বিশ্ববাসীকেও মনেপ্রাণে ভালোবাসতে পারি। আর যে স্বদেশবাসী, সে বিশ্ববাসীও বটে। স্বদেশের নদী নির্ঝর, বন-উপবন, গিরি-পর্বত, তার মানুষ এবং স্বভাবা ও সংস্কৃতি বিশ্বেরও মহা সম্পদ। কাজেই স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের উৎস এক ও অভিন্ন। তাদের মধ্যে কোনো সংঘাত নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- "ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা, তোমাতে বিশ্বময়ী- তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।" দেশজননী ও বিশ্বজননী এক ও অভিন্ন। কারণ দেশজননীর বুকের ওপর বিশ্বজননীরও আঁচল পাতা। স্বদেশ এবং বিশ্ব আমাদের ঐক্য চেতনার এপিঠ আর ওপিঠ।

স্বদেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্য: স্বদেশপ্রেম মানব চরিত্রের এক স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ যেমন দেশপ্রেমের পরিচয় বহন করে, তেমনই সাহিত্য, শিল্পকলা বা অন্যান্য জাতীয় স্বার্থের ক্ষেত্রে কাজ করাও দেশপ্রেমের লক্ষণ। তাই প্রত্যেকের কাজ হবে যার যার ক্ষেত্রে দেশের কল্যাণের কথা চিন্তা করে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করা- যাতে স্বদেশের উন্নতি সাধিত হয়। দেশপ্রেম মানুষকে জানতে শেখায়, ভালোবাসতে শেখায়। স্বদেশপ্রেমের মাধ্যমেই বিশ্বপ্রেম এগিয়ে যাওয়া যায়। ফলে মানবতার মহান আদর্শের সম্প্রসারণ ঘটে।

উপসংহার: স্বদেশপ্রেম মানুষের সহজাত মহৎ প্রবৃত্তি। যথার্থ দেশপ্রেমিক দেশের স্বার্থে উর্ধ্বে স্থাপন করেন না নিজের স্বার্থকে। দেশের স্বার্থে হাসিমুখে আত্মবিলদান করতে পারেন তিনি। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে শহিদ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠরা দেশপ্রেমিক ছিলেন। আমাদের সবাইকে স্বার্থহীন দেশপ্রেমিক হতে হবে। ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে স্বদেশপ্রেমকে। তবেই স্বাধীন জাতির মর্যাদা নিয়ে আনন্দের সঙ্গে বেঁচে থাকা যাবে।

চরিত্র

ভূমিকা: মানবজীবনে কাজকর্মে, চিন্তাভাবনায়, আচার-ব্যবহারে একটা বিশেষ ভূমিকা যখন অভিভাত হয় তখন তাকে চরিত্র বলে অভিহিত করা যায়। চরিত্র মানুষের অমূল্য সম্পদ। যিনি চরিত্রবান তিনি সমাজে যেকোনো বিরাট সম্পদশালীর চেয়ে বেশি সম্মান পেয়ে থাকেন। আর যার চরিত্র নেই, সে যত সম্পদশালী বা ক্ষমতাবানই হোক না কেন, তাকে কেউ শ্রদ্ধা করে না। চরিত্র মানুষকে স্বতঃ বৈশিষ্ট্য দান করে, মানুষকে বিশিষ্ট করে তোলে এবং চরিত্রের মাধ্যমে মানুষ নিজের পরিচয় লোকসমাজে তুলে ধরে। চরিত্রবান লোকদের জনিত সমাজে শান্তি ও সৌন্দর্য বজায় থাকে। যার চরিত্র – নেই, জীবনে গৌরব করার মতো তার কিছুই নেই। চরিত্র চরিত্র মানে সবধর্ম। কোনো লোকের বিশেষ আচরণ বৈশিষ্টকে চরিত্র বলা যায়। মানবজীবনে চলায়-ফেরায়, কথা-বার্তায়, কাজে-কর্মে, আচার-আচরণে এবং চিন্তাধারায় যে মহৎ ভাব পরিলক্ষিত হয়, তাকেই বলে চরিত্র।

চরিত্রের বৈশিষ্ট্য: চরিত্র বলতে যে ধারণা বোঝায় তাতে আছে কতকগুলো গুণের সমাবেশ। সত্য ও ন্যায়ের পথে যে বিচরণ করে, কাজেকর্মে যে আন্তরিকতা দেখায়, সব মানুষের জন্য যার মনে সহানুভূতি সঞ্চিত থাকে, পরের কল্যাণের জন্য যার আগ্রহের অন্ত নেই, এমন লোককে চরিত্রবান বলে মনে করা হয়। মানবজীবনে সব গুণের সমাবেশে চরিত্র গড়ে ওঠে বলে চরিত্রবান মানুষই সবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বিশ্বের মানবজীবনকে আনন্দময় করার জন্য তাদের অবদান অনস্বীকার্য। তাই মানুষের লক্ষ্য জীবনের সব আচার-আচরণের মাধ্যমে এমন চমৎকার বৈশিষ্টের পরিচয় দেওয়া যাতে সুন্দর চরিত্র গড়ে উঠতে পারে এবং পরিণামে শ্রেষ্ঠ মানব হিসেবে মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়। ফুলের সৌরভ যেমন চারদিকে ছড়িয়ে মানব-হৃদয়কে মিষ্টিত করে, তেমনই মহৎ চরিত্রের সৌন্দর্য সবার মন আকৃষ্ট করে এবং সবার হৃদয়ে একটা শ্রদ্ধা ও মর্যাদার আসন লাভকরতে সমর্থ হয়। সত্যের প্রতি নিষ্ঠা, অন্যায়ের প্রতি অনীহা, প্রলোভনকে জয় করা, নেরাজকে উপেক্ষা করা- এ সবই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচনার যোগ্য।

সচ্চরিত্রের লক্ষণ: সৎ মহাপুরুষ পৃথিবীর বুকে যুগে যুগে অমর কীর্তি রেখে গেছেন, তাঁরা সবাই ছিলেন চরিত্রবান। নামমাত্র নৈতিকতা বা ন্যায়নীতির চিহ্ন নয়; ন্যায়, সত্য, সুন্দর ও জ্ঞানের পথে থেকে যাঁরা কোনো দিনই বিচ্যুত হননি অর্থাৎ মানবীয় মানবিক গুণাবলির সমষ্টি যাঁদের চরিত্রে ঘটেছে, তাঁরাই সচ্চরিত্রবান। তাই তাঁরা যুগ যুগ ধরে মানবসমাজের জন্য কর্মশক্তির প্রেরণার উৎস হয়ে রয়েছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে বিশ্বনবি হজরত মুহম্মদ (স), হজরত ইব্রাহিম (আ), হজরত আবুবকর (রা), হজরত উমর ফারুক (রা), হজরত আবদুল কাদির জিলানি (র), হাজী মুহম্মদ মহসীন প্রমুখ মহাপুরুষদের নাম করা যায়। তাঁরা সবাই তাঁদের বলিষ্ট চরিত্রের গুণে শতাব্দীর পর শতাব্দী পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন।

চরিত্র গঠন: চরিত্র গঠনের জন্য মানুষকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। মানবশিশুর জন্মের পর থেকে শৈশব ও কৈশোরের অতিক্রমের সময় পর্যন্ত চরিত্র গঠনের কাল। জীবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমান্বয়ে এমন একটি পর্যায় আসে যখন জীবনের বৈশিষ্ট্যের মূল কাঠামো দাঁড়িয়ে যায়। পরবর্তী জীবনে যেভাবে আরও তেমন পরিবর্তন আসে না। তাই চরিত্র গঠনের জন্য জন্মের পর থেকে কাজ শুরু হয়। মাতা-পিতার হাতে চরিত্রের প্রথম রূপায়ণ এবং শিক্ষক ও অন্যান্য অভিভাবক আর পরিবেশের প্রভাব পড়ে ধীরে ধীরে একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট কাঠামো দাঁড়ায়। যখন পর্যন্ত শিশুর নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশ না ঘটে ততদিন পর্যন্ত চরিত্র গঠনের জন্য অভিভাবকদের সময় প্রচেষ্টা চালাতে হয়। কীভাবে শিশুর মধ্যে মহৎ গুণাবলির বিকাশ ঘটে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। সুশিক্ষা শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য যাতে জীবনে সফলভাবে প্রতিফলিত হতে পারে সে বিষয়েও লক্ষ রাখতে হবে। সুশিক্ষা লাভ হলে চরিত্র গঠন সহজ হয়।

চরিত্র গঠনে পরিবেশের ভূমিকা: চরিত্র গঠনে পরিবেশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে চরিত্র গঠিত হয়। পরিবেশের নিয়মে প্রতিবেশী ও সহচর দিবসের চরিত্র গঠনে প্রভাব বিস্তার করে। পরিবেশ যদি মানুষ অনুকূল হয়, তবে জীবনের বিকাশ সুষ্ঠ হবে। পরিবেশ প্রতিকূল হলে মানুষের চরিত্র বিনষ্ট হয়। মন্দ পরিবেশ থেকে ভালো চরিত্রের মানুষ আশা করা যায় না। তাই পরিবেশ যাতে কলুষিত না হয় সেদিকে সবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। কুসংসর্গের প্রভাব চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। অসংসর্গে পড়ে অনেকেই বিভ্রান্ত হয়। ফলে চরিত্রের সার্থক ও সুন্দর বিকাশ আশা করা যায় না। সৎসংসর্গের প্রভাবে জীবন সুন্দর ও মধুময় হয়, উত্তম চরিত্র গঠিত হয়। তাই অসৎসংসর্গ এড়িয়ে সৎ পরিবেশ থেকে সব সময় দূরে থাকতে হবে।

চরিত্রহীনতার কুফল: চরিত্রহীন মানুষ পশুর চেয়েও অধম। চরিত্রবান না হলে মানুষ লোভ লালসার মত হয়ে পড়ে এবং পাপ কাজে লিপ্ত হয়। নামে মানুষ হলেও তখন আর তাদেরকে মানুষ বলা চলে না। জীবনে তারা কারও প্রশ্না ও ভালোবাসা পায় না, সমাজের সবাই তাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখে। এ ধরনের লোক মানবজাতির কলঙ্ক। মানবসমাজে তাদের স্থান নেই; বিদ্যাবুদ্ধি, ধনসম্পদ তাদের তাতে কী লাভ না কেন, কিছুতেই তারা লোকের প্রশ্না অর্জন করতে পারে না। শুধু তাই নয়, চরিত্রহীন মানুষকে অভিশাপ ও অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়।

উপসংহার: চরিত্র মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে উন্নীত করে। চরিত্রই মানুষকে যথার্থ মানুষ করে তোলে। চরিত্র ছাড়া মানুষের গৌরব করার মতো আর কিছুই নেই। মানুষের শ্রদ্ধাভক্তি যদি মানুষের প্রাপ্য হয়, তা হয় শুধু চরিত্রের জন্য। চরিত্রের জন্য মানুষের সুনাম অর্জিত হয়, সবাই শ্রদ্ধা করে ও জীবন সার্থক হয়। চরিত্রবান লোকেরা জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

পিতামাতার প্রতি কর্তব্য

অথবা, মাতাপিতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

ভূমিকা: পিতামাতা আমাদের জন্মদাতা। পিতামাতা সমতুল্য আপনজন পৃথিবীতে আর নেই। এ কথায় আছে, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" অর্থাৎ, জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হতেও শ্রেষ্ঠ। মহানবি হজরত মুহম্মদ (স.) বলেছেন, "মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত।" আমরা ভূমিষ্ঠ হবার আগে ও পরে সন্তানের জন্য মা-ই সবচেয়ে বেশি দুঃখ-কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেন। সেই সঙ্গে পিতাও তাদের ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারের জন্যই সন্তান বড় হতে পারে। তারা পৃথিবীতে মহান আল্লাহর রহমত স্বরূপ। সন্তান জন্মের পর থেকেই পিতামাতা নিজেদের সুখের কথা ভুলে দিয়ে সন্তানের সুখের কথা ভাবেন। সন্তানকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন। তাই পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য অনেক।

পিতামাতার অবদান: পিতামাতার জন্যই সন্তান এই সুন্দর পৃথিবীর রূপ-রস, আরাম-আয়েশ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করার সুযোগ পেয়েছে। শিশুসন্তানের প্রতি পিতামাতার অবদান অপরিসীম ও বর্ণনাতীত। মা অতি কষ্টে দশ মাস দশ দিন সন্তানকে তার গর্ভে ধারণ করেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই মা ঘুমঘুম ও দুর্বল শরীর নিয়ে সন্তানের সেবাযত্ন করেন। মাতৃস্তন্য পান করে শিশু বেঁচে থাকে। সন্তানের জন্য মায়ের চিন্তার যেন শেষ নেই। নিজেদের আরাম-আয়েশ ভুলে গিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমের ভেতর দিয়ে পিতামাতা সন্তানদের বড় করে তোলেন এবং লেখাপড়া শেখান। সন্তানের আহারে জোগাড় করেন। সন্তান যাতে সুশিক্ষা লাভ করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেজন্য পিতামাতার চেষ্টার অন্ত থাকে না। প্রত্যেক পিতামাতাই তাদের সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ করে - গড়ে তুলতে চান। পিতা নিজে কষ্ট স্বীকার করেও সন্তানের জন্য ধন সঞ্চয় করে যেতে চেষ্টা করেন। তাদের এরূপ নিঃস্বার্থ ত্যাগের তুলনা নেই। সন্তানের কোনো অসুখবিসুখ হলে পিতামাতার তখন চিন্তার শেষ থাকে না। আহার-নিদ্রার কথা ভুলে গিয়ে তারা তখন সন্তানের আরোগ্য লাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং আল্লাহর উদ্দেশে হাত তুলে দোয়া চান সন্তানের জন্য। এমনকি নিজের জীবনের - বিনিময়ে তারা সন্তানের জীবন ভিক্ষা চান। মাতাপিতার এরূপ অবদান অতুলনীয়।

পিতামাতার প্রতি কর্তব্য: মানুষের মতো মানুষ হয়ে পিতামাতার মুখ- উজ্জ্বল করা সন্তানের অন্যতম কর্তব্য। সন্তান যদি সুশিক্ষিত হয়ে - সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হয় ও সুনাম অর্জন করতে পারে, - তবে পিতামাতা সবচেয়ে বেশি সন্তুষ্ট হন এবং গৌরববোধ করেন। পিতামাতার সন্তান হিসেবে প্রত্যেক ছেলেমেয়ের মনে রাখা উচিত, যেহেতু পিতামাতা সব সময় সুখেদুঃখে, বিপদে আপদে সব অবস্থায় তাদের কল্যাণ কামনা করেন, সেহেতু তাদের উচিত পিতামাতার - উপদেশ নির্দেশ মেনে চলা। আমরা অনেক সময় পিতামাতার আদেশ নির্দেশ পালন করি না। বরং কখনো কখনো তাদের উপদেশের বিপরীত কাজ করে থাকি। এতে পিতামাতা যে কতটা মানসিক কষ্ট ভোগ করেন তা বলে বোঝানো যাবে না। সন্তান ছোট হোক, বড় হোক, বিদ্বান কিংবা বুদ্ধিহীন হোক- পিতামাতা সব সময় তার মঙ্গল কামনা করেন। সন্তান যদি পিতামাতার উপদেশ ও নির্দেশ মেনে চলে সেটা মেনে চলা যেমন মঙ্গলজনক তেমনই সমাজের জন্যও কল্যাণকর। সন্তান যদি নির্বাহন হয়, জ্ঞানীগুণী বলে সমাজের প্রশংসা পায়, তাহলেই পিতামাতার ঋণ কিছুটা পরিশোধ হতে পারে। তাই পিতামাতার মুখ উজ্জ্বল করা ও তাদের গৌরব বৃদ্ধি করার জন্য প্রত্যেক সন্তানেরই তৎপর হওয়া উচিত। কিন্তু সন্তান যদি পিতামাতার অবাধ্য হয় এবং উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়, তবে তার জীবন সফল অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। পিতামাতার সেবা-শুশ্রূষা করা সন্তানের কর্তব্য। তারা অসুস্থ হয়ে পড়লে সব সঙ্গে তাদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। এতটুকু দেরি করা যাবে না, কেননা তাতে তারা মনে কষ্ট পেতে পারেন। তাদের সেবাযত্নে বিন্দুমাত্র ত্রুটি যাতে না ঘটে, সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। পিতামাতার বৃদ্ধ বয়সে উপযুক্ত সৎ স্ত্রী ছেলে-মেয়ে নিয়ে অন্যত্র চলে গেলে সে মহাপাপী হবে। সন্তানের সব সময় মনে রাখতে হবে, শিশুকালে পিতামাতা তাকে মানুষ করে তোলার জন্য যা নিয়েছিলেন, লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং বড় হলে সুখী ও সার্থকভাবে জীবনযাপন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা দিয়েছিলেন। তাই এই জীবন কর্তব্যে সন্তান কর্তব্য পালন করা হবে না, বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতা যাতে সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারেন সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতে হবে এবং তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যদি কোনো সন্তান পিতামাতার প্রতি অমনোযোগ ও অবহেলা দেখায় তবে তার পাপের শেষ থাকবে না।

পিতামাতার প্রতি সম্মান: প্রত্যেক ধর্মেই পিতামাতাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআন শরিফে ভক্তি ও শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে আল্লাহর পরেই পিতামাতার স্থান নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। হজরত আবদুল কাদের জিলানি (র), হজরত বায়েজিদ বোস্তামি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ পিতামাতার বাধ্য ও অনুগত ছিলেন। এজন্য তারা আজ স্মরণীয় হয়ে আছেন। সুতরাং পিতামাতা মনে কষ্ট পায় এমন কাজ কখনো করা উচিত নয়। নানা ধর্মে ও নানা মতে বক্ত পিতামাতার এই সম্মান রক্ষার দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রত্যেক মানব সন্তানকে সচেতন হওয়া দরকার।

উপসংহার: পিতামাতা সন্তানের পরম হিতৈষী। এমন আপনজন দুনিয়াতে আর কেউ নেই। অল্প বয়সে যে ব্যক্তি পিতামাতাকে হারায় সে এ জগতে সতি ভাগ্যহীন। পিতামাতাই বেহেশতের শ্রেষ্ঠ দান। তা যে ব্যক্তি বেশিদিন ভোগ করতে পারে, তার জীবন ধন্য হয়। পিতামাতার প্রতি কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহ লাভ করে পৃথিবীতে স্মরণীয়, বরণীয় এবং মর্যাদা এ লাভ করা যায়।

শিষ্টাচার

অথবা, শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ

ভূমিকা: মানবজীবনের অত্যাবশক গুণাবলির অন্যতম হলো সৌজন্য ও শিষ্টাচার। দেহের সৌন্দর্য অলংকার; কিন্তু আত্মার সৌন্দর্য শিষ্টাচার। অলংকার বাইরের সামগ্রী আর শিষ্টাচার অন্তরের এবং সৌজন্যবোধ হলো তার মিলিত প্রকাশ। প্রাতিষ্ঠিক জীবনচর্চা ও জীবনবিকাশের সবচেয়ে সতর্ক থাকাবলি অপরিহার্য। চলনে-বলনে, আচরণে, পোশাক-পরিচ্ছদে এবং ব্যক্তি, অভিজাতা ও চারিত্রিক দীপ্তি প্রকাশেও এ গুণগুলো ক্রিয়াশীল থাকে। ঘরে বাইরে সর্বত্র শিষ্ট। আচরণ ও সৌজন্য না থাকলে চলে না ব্যক্তির জীবন, চলে না সমাজের জীবন। সমাজবদ্ধ জীবনে শিষ্টাচার একটি অপরিহার্য চারিত্রিক সম্পদ— ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক ঐশ্বর্য।

বৈশিষ্ট্য: বুৎপত্তিগত অর্থে সৌজন্য ও শিষ্টাচারের মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। প্রকৃতপক্ষে সৌজন্য, শিষ্টাচার, আদব-কায়দা তিনটিই সমার্থক। শিষ্টতা, নম্রতা, ভদ্রতা, মার্জিত এবং নীতিসিদ্ধ ব্যবহার ইত্যাদি ব্যক্তির অন্তরের ও বাইরের আবশ্যিক উপাদান। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, শিষ্টাচার যেন অন্তরের সম্পদ, সৌজন্য বাইরের অলংকার-দুটিই এনে দেয় ব্যক্তির পূর্ণতা এবং মনুষ্যত্বের গৌরব। শান্তশিষ্ট মার্জিত ব্যবহারের ওপরই গড়ে ওঠে ব্যক্তির বাইরের ভব ও সৌজন্যমূলক আচরণ। প্রাতিষ্ঠিক অতিফুদ্ধ কাজ ও আচরণেই এবং বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রেও শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ বা আদব-কায়দা আবশ্যক।

বৈশিষ্ট্য: বুৎপত্তিগত অর্থে সৌজন্য ও শিষ্টাচারের মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। প্রকৃতপক্ষে সৌজন্য, শিষ্টাচার, আদব-কায়দা তিনটিই সমার্থক। শিষ্টতা, নম্রতা, ভদ্রতা, মার্জিত এবং নীতিসিদ্ধ ব্যবহার ইত্যাদি ব্যক্তির অন্তরের ও বাইরের আবশ্যিক উপাদান। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, শিষ্টাচার যেন অন্তরের সম্পদ, সৌজন্য বাইরের অলংকার-দুটিই এনে দেয় ব্যক্তির পূর্ণতা এবং মনুষ্যত্বের গৌরব। শান্তশিষ্ট মার্জিত ব্যবহারের ওপরই গড়ে ওঠে ব্যক্তির বাইরের ভব ও সৌজন্যমূলক আচরণ। প্রাতিষ্ঠিক অতিফুদ্ধ কাজ ও আচরণেই এবং বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রেও শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ বা আদব-কায়দা আবশ্যক।

শিষ্টাচারের গুরুত্ব: মানুষের জীবনে শিষ্টাচার বা সৌজন্যবোধ কিংবা আদব-কায়দার গুরুত্ব অপরিসীম। ছাত্রজীবন মানুষের সমগ্র জীবনের। একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিষ্টাচার গড়ে ওঠার প্রকৃত সময়ই হলো ছাত্রজীবন। শিক্ষার্থীদের বই-পুস্তকের পাঠিগত বিদ্যা অর্জনের সাথে সাথে সদাচারে সম্পর্কিত শিক্ষা অর্জন করা প্রয়োজন। কারণ পাঠিগত বিদ্যা যেমন একজন শিক্ষার্থীকে জ্ঞানী হতে শেখায়, তেমনই শিষ্টাচারও তাকে সভ্য ভদ্র ও নাগরিক জনসম্পদ হতে শেখায়। বিদ্যালয়ের ডিগ্রির সাথে সাথে একজন মানুষের সভ্যতার মানও বৃদ্ধি পায়। জীবনকে মধুর এবং মহৎ করার ক্ষেত্রে শিষ্টাচারের গুরুত্ব অনেক বেশি। অপরকে আনন্দ দিতে নিজে আনন্দিত হওয়া এবং অপরের কাছ থেকে সম্মান অর্জন করা এটি জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া। মানুষের এ পাওয়ার পিছনে শিষ্টাচারের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। অধিকার লাভ করাই বড় কথা নয়— মানুষের মন জয়ই বড় কথা। শিষ্টাচারের মাধ্যমে মানুষের মন জয় করা যায়।

সামাজিক রীতি ও শিষ্টাচার: যে সমাজ যত সভ্য, তার লোকব্যবহার। তত মার্জিত, সম্ভাষণমূলক এবং সুরুচিবাণক। সেই লোকব্যবহারের কোথাও কোথাও আন্তরিকতাহীন, বাহিক রীতিমাত্র বলে ভ্রম হয়। সামাজিক অনুষ্ঠানে সৌজন্য এবং শৌষ্ঠব রক্ষার জন্য কতকগুলো সাধারণ সর্বজনীন রীতি অনুসরণ করে চলতে হয়। ভদ্রতা বাইরের আচরণীয় রীতিমাত্র নয়। রীতি শুধু বাইরের অভ্যাসমাত্র, তাতে অন্তরের স্পর্শ থাকে না। শিষ্টাচার অন্তরের বিকশিত কুসুম, হৃদয়ের অমূল্য সম্পদ।

মনুষ্যের নিয়তি: সবার আগে মানুষের সঙ্গে মানুষের সদাচরণ ও প্রীতির সম্পর্ক চাই। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "আমরা মানুষ, মানুষের মধ্যে আমরা বড় হই।" আমাদের দরকার অনেক মানুষের জন্য, তাদের সঙ্গে নানাপ্রকার আচরণের আদান-প্রদান চলার জন্য আমাদের অনেকগুলো প্রবৃতি আছে।" বাস্তবিকই মানুষের সঙ্গে মানুষের শিষ্ট সুন্দর সম্পর্কই বৃহত্তর সমাজ রচনা করে। পিতামাতা, ভাইবোন, পুত্রকন্যা, আণীয়-প্রতিবেশী ইতাদি নানারণের মানুষের পরিবার। এই পরিবারকে সতর্সুন্দর করে প্রীতির আচরণ। শুধু তা-ই নয়, দুঃখী আর্তের প্রতি করুণা ও সেবা, সম্মানিতের প্রতি শ্রদ্ধা, তোয়ার প্রতি অনুগ্রহ, প্রতিকবিকাশী প্রতি অনুজ্ঞা দিয়ে ইত্যাদি অভুতপূর্ব প্রতিরোধ অভুতপূর্ব সম্পর্কের গাঁথুনিও নির্মিত হয়েছে। এই আদর্শ আচরণবিধিই নিয়তির জীবনের লক্ষ্যে। পৌঁছে দেয়, যেমন বায়ুবিষুক্ত সমুদ্রে নৌকার হাল নৌকাকে নিয়ন্ত্রণ করে লক্ষ্যে নিয়ে যায়। কাজেই পরিবারের মধ্যে আত্মসংযমের অভীপ্সা না হলে পরিবারে চলে না, সমাজ ও রাষ্ট্রেও চলে না। ব্যক্তিজীবন কঠিন অভ্যাসের মাধ্যমে গড়ে তুলতে হয় এবং অন্তর বহিরাচার। শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ গড়া থেকেই সবাইকে সতর্ক করায়, অশিষ্ট, অন্যায়, উদ্ধত এবং ইতরোচিত ব্যবহার থেকে বিরত করায়; মিথ্যাবাদিতা, নির্লজ্জতা, দ্রুত ভাষণ বা অগ্রিম ভাষণ, রুচিহীন, অমার্জিন, উগ্র ও উত্তেজক পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান ইতাদি অসামাজিক উপসর্গগুলো সম্পর্কে আত্মসচেতন করায়।

শিষ্টাচার ও সৌজন্যের অভাবের ভয়াবহতা: শিষ্টাচার ও সৌজন্যের অভাব হলে শিষ্ট উক্ত কেউ রচিয়াকে, শাসকের অপশাসন বিরোধী হয়ে প্রজাকে। পিতামাতার দুর্ব্যবহার অপমানিত করে পুত্রকন্যার। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অমার্জিত আচরণ ক্ষতিগ্রস্ত করে ছাত্রসমাজকে। একজন এটিই সমাজের মধ্যে চলেছে পারস্পরিক অসাচার, অসৌজন্যের প্রতিক্রিয়া। সামান্য ভদ্রতা, শিষ্টতা ও নৈতিকতার অভাবে সর্ব স্তরের মানুষ ধীরে ধীরে সামাজিক সম্পর্ক হারায়। উপর তলার সঙ্গে নিচের তলার মানুষের চরিত্রেও ঘুণ ধরে। সদাচার ও সৌজন্যের দায়বদ্ধতা না থাকলে সামান্য ছলছলাছলিও থাকে না। ফলে চরমে ওঠে মিথ্যাচার, শঠতা, ধান্ধা ও ধান্দাবাজি। ভাগ্যবিলাস এবং অর্থলিপ্সা হয় বেপরোয়া। আজকাল সিনেমায় শিল্পসাহিত্যে নিষেধ হিংস্রতা ও অশ্লীলতার প্রকাশমান।

বিজ্ঞান ও আধুনিক জীবন

অথবা, বিজ্ঞান ও আধুনিক সভ্যতা

ভূমিকা: বিখ্যাত বিজ্ঞান-গবেষক কলিন কেনান বলেছেন, "মানুষের মনে বিজ্ঞান চেতনার দীপশিখা প্রথম জ্বলে ওঠেছিল আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে, মধ্যপ্রাচ্যে।" সেই সময় সভ্য মানুষ শুধু প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনে নয়, নিছক জানার বা বোঝার আগ্রহেই নানা বিষয় সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান আহরণ করতে শুরু করে। বর্তমান সভ্যতা মানুষের বহু শতাব্দীর সাধনার ক্রম-পরিণাম। মানুষ তার যুগ-যুগান্তরের স্বপ্ন ও সাধনার অনবদ্য ফসল দিয়ে গড়ে তুলেছে সভ্যতার এই বিশাল ইমারত। বিজ্ঞানই মানুষের অতর্দ সাধনার ফসল। কালক্রমে মানুষ বিজ্ঞানকে তার সভ্যতার বিজয়রথের বাহন করে। শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে এসে উপনীত হয়েছে বর্তমানের পাদপীঠে। বলাবাহুল্য, মানুষের সভ্যতার এই চরম সমৃদ্ধির মূলে রয়েছে বিজ্ঞানের অপরিসীম বিস্ময়।

প্রাচীন যুগে বিজ্ঞান: 'আলেকজান্দ্রিয়ার মক' প্রথম তৈরি করেছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার বিজ্ঞানীরা আজ থেকে দুই হাজার বছরেরও আগে। জল তোলার উপযোগী বিশেষ ধরনের পাম্প এবং যন্ত্রচালিত ঘড়ি। প্রথম আবিষ্কৃত হয় চীন দেশে। প্রথম ছাপাখানা এবং কম্পাস যন্ত্র ওই দেশেরই আবিষ্কার। এ সমস্তই ঘটেছিল গ্রিসের আগে। গ্রিসের মানুষের প্রথম পৃথিবী ও মহাকাশের মানচিত্র বানায়। প্রাণিবিদ্যার ক্ষেত্রে, চিকিৎসাশাস্ত্র, স্থাপত্যবিদ্যা এবং জ্যামিতির ক্ষেত্রে গ্রিক বিজ্ঞানীদের অবদান বড় কম ছিল না। অন্যদিকে বীজগণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, শল্যচিকিৎসা, রসায়নশাস্ত্র, জীববিদ্যা প্রভৃতির ক্ষেত্র প্রাচীন ভারতের ও আরব দেশের বিজ্ঞানীরা যেসব তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন, তা মানুষের জীবনযাত্রাকে যথেষ্ট সহজ করে দেয়। জলসেচের কিংবা বাতাসের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রাচীন গ্রিস ও ইরাকের বিজ্ঞানীরা যথাক্রমে ওয়াটার মিল ও উইভমিল বানিয়েছিলেন। আজকের জীবনে বিজ্ঞানের সফল ব্যবহার মানুষের দীর্ঘকালব্যাপী সাধনার গৌরবময় ফল।

আধুনিক যুগে বিজ্ঞান: সভ্যতার অগ্রযাত্রার পথে আজকের হাতে বিজ্ঞান পূর্ণমাত্রায় সমৃদ্ধি লাভ করেছে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বিজ্ঞান নতুন শক্তি নিয়ে অবতীর্ণ হলো। শিল্পজগতে নতুন আলোড়নের সৃষ্টি করল বিজ্ঞান। দ্রুত উৎপাদনের তাগিদে নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কারের হিড়িক পড়ে গেল। বিজ্ঞানের মহিমায় সমস্ত কাজকর্মই হচ্ছে যন্ত্রের সাহায্যে। আধুনিক বিজ্ঞানের অসীম শক্তিতে সবকিছুই এখন মানুষের হাতের মুঠোয়।

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান: দৈনন্দিন জীবনে মানুষ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে পূর্ণরূপে কাজে লাগিয়েছে ইউরোপে শিল্প-বিপ্লব ঘটে যাওয়ার পর থেকে, উনিশ শতকে। ওই সময়ই মানুষ বাষ্পের শক্তিকে নানান কাজে ব্যবহার করতে শেখে। তারপর ক্রমে ক্রমে বিদ্যুৎশক্তিকে কাজে লাগাতে শেখে। এই শতকে জ্বালানি কয়লা ছাড়াও পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস এমনকি পারমাণবিক শক্তিকে মানুষের কল্যাণের কাজে লাগানো হচ্ছে। বাষ্পশক্তি, প্রাকৃতিক গ্যাসের শক্তি, সৌরশক্তির বিদ্যুৎশক্তির ব্যাপক প্রচলন রয়েছে গৃহস্থের ঘরে ঘরে। পরিবহন ব্যবস্থায় বিজ্ঞান তো রীতিমত যুগান্তর এনেছে। হাজার হাজার মাইল দূরের পথ যাতের মুঠোয় এসেছে বিমানের বদৌলতে। বাস, ট্যাক্সি ও ট্রেনের সাহায্যে ছুটগতিতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যাওয়া যায়। জলপথে যাওয়া যায় লঞ্চ, স্টিমার ও ইঞ্জিনচালিত নৌকার সাহায্যে। মেশিনের সাহায্যে চাষাবাদ ও পাশের সাহায্যে ফসলের ক্ষেতে জলসেচন করা যায়। এ সবই বিজ্ঞানের দান। আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্রে টেলিভিশন ও ভিডিও বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলেও পৌঁছে গেছে। এখন আমরা ঘরে বসেই বিশ্বকাপ ফুটবল, বিশ্বকাপ ক্রিকেট, অলিম্পিক গেমস, কুস্তি, হাঁড়ি ইত্যাদি খেলা দেখা যায়। রেডিওর প্রভাতী ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভাঙে আমাদের। এ বিজ্ঞানের কৌশলে তলতলে কলে পানি এসে যায়। প্রয়োজনমতো কখনো সে পানি উষ্ণ, কখনো বা শীতল। সৌরশক্তিচালিত পকেট ক্যালকুলেটর করে দিচ্ছে দুরূহ হিসাব-নিকাশ। গৃহস্থালির কাজে কত রকম বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম যে আমরা ব্যবহার করছি, তার সঠিক হিসাব দেওয়া কঠিন। যেমন: রান্না করার জন্য রয়েছে কুকিং রেঞ্জ, রসলা বাটার মেশিন, রয়েছে বাসন ও কাপড় ধোয়ার যন্ত্র। এছাড়া ঘর সাফাই মেশিন, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, বৈদ্যুতিক পাখা, ফ্রিজ, টাইপ রাইটার থেকে শুরু করে ছোটদের জন্য রয়েছে ইলেকট্রিক খেলনা। রোটারি বা নানা প্রকার অফসেট মেশিন তো বিজ্ঞানেরই অবদান। আছে টেলিফোন, মোবাইল ফোন। এর মাধ্যমে আমরা প্রতিনিয়ন অফিস-আদালত, ব্যবসায়-বাণিজ্যে ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেক কাজ সেরে নিতে পারছি। খৈজখবর নিতে পারছি আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের। চিকিৎসাবিজ্ঞানও আমাদের প্রতিদিনের জীবনকে নিরাময় রাখছে। রোগ-বালাই প্রয়োজনে আবিষ্কৃত হয়েছে শুধু। নানা দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা সম্ভবপর হয়েছে এই বিজ্ঞানের বদৌলতে। আলট্রাসোনোগ্রাফি এবং এক্স-রে আবিষ্কার এ ক্ষেত্রে নবযুগের সূচপাত করেছে। কলেরা, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, বসন্ত ইত্যাদি ব্যাধি নিরাময় করার ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যুগান্তর এনেছে। পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হওয়ার কারণে মৃত্যুপথযাত্রী বহু রোগী বাঁচার আশ্বাস পেয়েছে।

বিজ্ঞানের কুফল: প্রাত্যহিক জীবনে অতিমাত্রায় যন্ত্রনির্ভরতার কুফলও কম নয়। বিজ্ঞান আমাদের এই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে, আমাদের নিত্য জীবনযাত্রাকে করেছে আরামদায়, বিলাসময়। বিজ্ঞান যেন মানুষের প্রাণকে হরণ করেছে, তার সহজ ও স্বাভাবিক অনায়াস জীবনচর্চাকে করেছে ব্যাহত। তার শরীর ও মন যেন প্রকৃতির আনন্দময় প্রদায়ক সাধিনা থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। যতকে আমরা যত বেশি প্রশ্রয় দেব ততই জীবনে কুঁজোমতা, অবসাদ বাড়বে। বর্তমান শতকে কলের মানুষ রোবটের হয়তো গৃহস্থের কাছে সামালবে, ঘর, বাসন সাফ করবে, রান্না কাজ সেরে ফেলবে, কম্পিউটারের নির্দেশে আমরা ঘুম থেকে জেগে উঠব, তার হিসাবমতো চলব ঠিক এমনটা আমাদের কাম্য নয়।

উপসংহার: আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এক হয়ে গেছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানকে বাদ দিলে আমাদের সবার বেঁচে থাকা দুরূহ। মানুষ বিজ্ঞানকে ব্যবহার করছে তার নিত্যকর্মে। দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান মানুষকে কেবল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিচ্ছে না, প্রতি মুহূর্তে বিজ্ঞানের প্রয়োগ তার মনকে করছে পরিশীলিত, বিশ্ববিধানের স্বরূপ উপলব্ধিতে প্রণোদিত করছে। আমাদের জীবনে তাই আমরা বিজ্ঞানকে বরণ করেছি প্রয়োজনের অনুরাগে।

মানবকল্যাণে বিজ্ঞান

অথবা, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

ভূমিকা: ইংরেজি ভাষায় একটা প্রবাদ আছে— 'Necessity is the mother of invention'- প্রয়োজনের তাগিদেই আবিষ্কারের জন্ম। জীবনসংগ্রামের তাগিদেই মানুষ অজানাকে জানতে চেয়েছে। অজানাকে জানার ইচ্ছা জন্ম দিয়েছে বিজ্ঞানের, আর বিজ্ঞান দিয়েছে মানুষকে গতি, সেই সঙ্গে স্বনির্ভরতার আশ্বাস। যুক্ত হলো বিজ্ঞানের সহযাত্রা। ক্রম অজ্ঞানতার অন্ধকার বিদূরিত হলো বিজ্ঞানের সাধনায়। মানুষ করায়ত্ত করতে শিখল প্রকৃতির দুর্জয় শক্তিকে। বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান হয়ে, আর প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে মানুষ অনিয়ন্ত্রিত প্রকৃতিকে নিয়ে এলো নিজের নিয়ন্ত্রণে, মানবকল্যাণে কাজে লাগাল বিজ্ঞানকে।

বিজ্ঞানচেতনার প্রসার: সেই আদিম যুগে গোষ্ঠীবদ্ধ যাযাবর মানুষের জীবনে যুগান্তর আনল আগুনের আবিষ্কার আর কৃষিকাজের প্রচলন। সেই সময় গড়ে উঠল ছোট ছোট গ্রাম। উন্নতিত হলো আদি কৃষিজন 'লাঙল'। মানুষ খেতে জলসেচের জন্য তার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে শিখল। শস্য সংরক্ষণ, ফলে থাকে আরো নানা প্রয়োজনীয় সামগ্রী (যেমন, কাপড় থেকে সুতা) বানাতে শিখল, চাকা ঘুরিয়ে মানুষ বানাতে শুরু করল নানা ধরনের মাটির পাত্র। ওই সময় যান শিল্পেরও উদ্ভব বটে। ভারি জিনিস সহজে তোলার জন্য ওই সময় মানুষ কপিকল, আলস প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্য নিতে শিখেছিল। 'পাপিরাস' জাতীয় নলখাগড়া থেকে মিশরের মানুষ প্রথম লেখার উপযোগী কাগজ তৈরি করে। ইরাক অঞ্চলের লোকেরা প্রথম চাকাযুক্ত গাড়ি বানিয়ে পরিবহন ব্যবস্থার যুগান্তর আনল। পানি তোলার উপযোগী বিশেষ ধরনের পাম্প এবং যন্ত্রচালিত ঘড়ি প্রথম আবিষ্কৃত হয় চীন দেশে। গ্রিসের মানুষেরা প্রথম পৃথিবী ও মহাকাশের মানচিত্র বানায়। প্রাণিবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, স্থাপত্যবিদ্যা এবং জ্যামিতির ক্ষেত্রে গ্রিকবিজ্ঞানীদের দান কম ছিল না। অনাদিকে বীজগণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, শল্যচিকিৎসা, রসায়নশাস্ত্র, জীববিদ্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারত ও আরব দেশের বিজ্ঞানীরা যেসব তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন, তা মানবজাতিকে যথেষ্ট সহায় করে দেয়।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা: আজ বিজ্ঞানের জয়ধ্বনি ঘোষিত হলেও পৃথিবীতে তার সূচনা হয়েছিল অভাবন্ত দীনভাবে। বিজ্ঞানের বলে মানুষ আজ খনির অন্ধকারে আলো জ্বালাতে সক্ষম হয়েছে। বিজ্ঞানের শক্তিতেই মানুষ দানবীয় নদীস্রোতকে বশীভূত করে উভর মরুপ্রান্তরকে করেছে জলসিক্ত, ভূগর্ভের সন্ধিত শস্যসম্ভাবনাকে করে তুলেছে সফল, দুই কূলে দিয়েছে পৃথিবীর অনুর্বরতার অবসান। বিজ্ঞান আজ উর্বরতা দিয়ে ক্ষিতিকে বসুধাকে শস্যবতী করে তুলেছে। নব নব শিল্প প্রকরণে সে উৎপাদন জগতে এনেছে যুগান্তর এবং সুদূরকে করেছে নিকটতম। বিজ্ঞানের সাফল্যে জীববাহী বসুধা আজ কলহাসমুখর।

মানবকল্যাণে বিজ্ঞানের অবদান: প্রাগৈতিহাসিক মানবের আগুন আবিষ্কারের দিন থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত মানুষের অন্তর সাধনা বিজ্ঞানকে করেছে সমৃদ্ধ, সভ্যতাকে করেছে গতিশীল। বাষ্পীয় শক্তিকে সে করেছে বশীভূত, বিদ্যুৎকে করেছে করায়ত্ত, মুঠোয় পুরে নিয়েছে পারমাণবিক শক্তিকে। ডাঙায় ছুটেছে বাস, ট্রেন, ট্যাক্সি; জলে ভেউরের বুকি জাপটে ধরে জাহাজ ছুটে চলেছে; আকাশ তোলপাড় করে উড়ে চলেছে কৃত্রিম উড়োজাহাজ; মহাশূন্যে পাড়ি দিচ্ছে রকেট, স্পুটনিক, মহাকাশযান। অনাদিকে বিজ্ঞান মৃত্যুর গ্রাস থেকে জীবনকে বাঁচিয়ে তুলতে ও প্রতিষ্ঠিতবদ্ধ দৈনন্দিন জীবনে মানুষ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে নানারূপে কাজে লাগিয়েছে ইউরোপে শিল্পবিপ্লব ঘটে যাবার পর থেকে, উনিশ শতকে। ওই সময়ই মানুষ বাষ্পের শক্তিকে নানা কাজে ব্যবহার করতে শেখে। তারপর আমরা ক্রমে ক্রমে বিদ্যুৎশক্তিকে কাজে লাগাতে শিখলাম। বিশ শতকে আমরা জ্বালানি কয়লা ছাড়াও পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস এমনকি পারমাণবিক শক্তিকে মানুষের কল্যাণে কাজে লাগাতে পেরেছি। বাষ্পশক্তি, প্রাকৃতিক গ্যাসের শক্তি, সর্বোপরি বিদ্যুৎশক্তির ব্যাপক প্রচলন ঘটেছে নাগরিক জীবন থেকে গৃহস্থের ঘরে ঘরে। তাই আধুনিক কালে তার সাহায্যতা ছাড়া আমাদের এক মিনিটও চলে না। আর ওই মিনিটের হিসাব করার জন্য প্রয়োজন হয় ছোট-বড় ঘড়ির। তার। কোনোটা আবার ইলেকট্রনিক। এসবই হচ্ছে বিজ্ঞানের কল্যাণ।

মানবকল্যাণে বিজ্ঞানের অবদান: আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায়ে মানুষ মৃত্যুর কবল থেকে ফিরে আসতে সমর্থ হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক রঞ্জনের আবিষ্কৃত 'রঞ্জন-রশি' (X-Ray), কুরি ও মাদামকুরি আবিষ্কৃত 'রেডিয়াম' বিজ্ঞান জগতে যুগান্তর এনেছে। রঞ্জন রশি এবং আলট্রাসনোগ্রাফির সহায়তায় শরীরের অদৃশ্য রুগ্ অনুসন্ধান হচ্ছে। 'রেডিয়াম' ক্যান্সারের মতো ভয়ংকর রোগের মারাত্মক বিষক্রিয়াকে। অনেকাংশে প্রতিরোধ করেছে। পেনিসিলিন, ক্লোরোমাইসিন ও স্ট্রেটোমাইসিন ইত্যাদি মহৌষধ আবিষ্কারের ফলে কোটি কোটি মানুষ নানান প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হেতে রক্ষা পাচ্ছে। লুই পাস্তুরের ইনজেকশন আবিষ্কৃত হওয়ার পর মানুষ জলাতঙ্ক রোগ থেকে রক্ষা পেয়েছে। দূরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধি বসন্তের জীবাণু নিবারণের জন্য ভাক্সিন আবিষ্কার করেন এডওয়ার্ড জেনার। এভাবেই বিজ্ঞানের কল্যাণে আমাদের বহু অভাব দূরীভূত হয়েছে, আমরা আনন্দ লাভ করেছি, সুখ-বাসন্দা পেয়েছি। সুতরাং আমাদের প্রাতহিক জীবনে বিজ্ঞানের অবদান যথেষ্ট।

উপসংহার: আমাদের প্রাতহিক জীবনের সঙ্গে এক হয়ে গেছে বিজ্ঞান। মানবকল্যাণে বিজ্ঞানের দানই শ্রেষ্ঠ। এজন্য বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর কাছে মানুষ চিরঋণী। বিজ্ঞানের দানে সত্যিই মানুষ বিশ্বজয়ী হয়েছে। সভ্যতার ক্রমাধিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের তুলনা নেই। বিজ্ঞানকে বাদ দিলে আজ আমাদের বেঁচে থাকা দুরুহ। বিজ্ঞানকে যদি ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহার না করে মানবকল্যাণে ব্যবহার করা যায়, তবে মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নতুন অধ্যায় সূচিত হবে।

বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

অথবা, বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব

ভূমিকা: শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সুপ্ত মনুষ্যত্বের জাগরণ; সৎ ও অসত্যের এবং ভালো ও মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করে আত্মোপলব্ধি। বিজ্ঞান শিক্ষা একটি বিশেষ ধরনের শিক্ষা হলেও শিক্ষার মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; বরং কোনো কিছু বিশেষভাবে জানার অর্থই যদি হয় বিজ্ঞান তো বিজ্ঞান শিক্ষার অর্থ এমন এক শিক্ষা যা মানুষকে বিভিন্ন বিষয়ে জানতে সহায়তা করে। অতএব, বিজ্ঞান শিক্ষা বলতে এমন এক শিক্ষা বোঝায়, যা আমাদের জ্ঞানজগতকে দূর করে যথার্থ জ্ঞানের আভাস দেয় এবং মনুষ্যত্বের জাগরণ ঘটিয়ে আত্মোপলব্ধি তথা বিশ্বজগতের স্বরূপ উপলব্ধিতে সহায়তা করে।

বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব: জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানকল্পে মানুষ একদা বিজ্ঞানচর্চা শুরু করেছিল। বিজ্ঞানের কল্যাণ মূর্তিতে বিমুগ্ধ মানুষ সেদিন পরম বন্ধুর মতো বরণ করে নিয়েছিল তাকে। বিজ্ঞানের হাত ধরে মানুষ সেদিন পেয়েছিল জীবনের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি, পেয়েছিল জীবনের সুখ এবং স্বাচ্ছন্দের আশ্বাস। মানুষ সেদিন বিজ্ঞানের সহকারে জীবনকে করে তুলছিল সহজ এবং স্বাভাবিক। বিজ্ঞানের এই গুণ ও বিশিষ্টতাকে মেনে নিলে সকল দেশে সর্বকালে এর উপযোগিতাকে মানতে হয়। যুগে যুগে মানুষ কমবেশি পরিমাণে তা মেনেও নিয়েছে। তাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানের মানুষ উদিত হচ্ছে, বিজ্ঞান শিক্ষাও হয়েছে সম্প্রসারিত। বিজ্ঞান আমাদের শিক্ষা দেয় যে শিক্ষা ধারাবাহিক বিশ্লেষণপন্থী ও বাস্তবসম্মত। একটি বাস্তব কার্যকারণ নিয়মের আবিষ্কার বিজ্ঞানের কাজ। কেন হচ্ছে, কী জন্য হচ্ছে, বিজ্ঞানই তা বলে দিতে পারে। বিজ্ঞানের ব্যাপক বিস্তারে, বিকাশে, রূপদানে যেকোনো জাতি বা দেশের সার্বভৌম উদ্ভাবন করে। কেবল ছোট বড় কলকারখানা গড়ে তোলা বিজ্ঞানের কাজ নয়, কৃষির উদ্ভাবন জ্ঞানও বিজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। চাষাবাদের উন্নতির জন্য, নদীর ধারা নিয়ন্ত্রণের জন্য, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, কুসংস্কার দূরীভূত, বেকারত্বের লাঘব ইত্যাদির জন্য বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। কাজেই বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব অনেক।

দেশ ও জাতি গঠনে বিজ্ঞান শিক্ষা: দেশ ও জাতি গঠনের ক্ষেত্রে নানা ধরনের বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। উন্নয়নশীল একটি দেশের জন্য প্রচুর ডাক্তার, প্রকৌশলী যেমন দরকার, তেমনি দরকার কৃষিবিজ্ঞানী ও পশুবিজ্ঞানী। তবে মনে রাখা দরকার যে, সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষা সবাই পাবে, কিন্তু কারিগরি বিজ্ঞান শিক্ষার আয়োজন করতে হবে দেশের প্রয়োজনের দিক লক্ষ রেখে। উচ্চতর বৈজ্ঞানিক গবেষণাও এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত, যাতে একদিকে তা দেশের কল্যাণ বিধানে সমর্থ হয় এবং অন্যদিকে বিদেশের কাছে স্বদেশের অনুমূতিকে উজ্জ্বল করে। উপযুক্ত কাজ না পেয়ে বিজ্ঞান বিদ্যায় উচ্চ শিক্ষিত বহু ব্যক্তি আজ যে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে, বিদেশে পড়ালেখা শেষ করে আর দেশে ফিরে আসছে না, এটা দেশ এবং জাতির জন্য অত্যন্ত লজ্জাকর ও ক্ষতিকর।

সামাজিক মানুষের জীবনে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রভাব: সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জীবনে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের কৃষকদের মধ্যে উপযুক্ত বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে যুগান্তর আনতে পারে। উন্নত বীজ, উপযুক্ত সার, কীটনাশক ওষুধ এবং এক কথায় বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদ সম্পর্কে তারা যদি শিক্ষা পায় তাহলে প্রতি কৃষিপ্লটে বিস্তরেই ফলানো সম্ভব। কলকারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের কিছুটা বিজ্ঞান শিক্ষা কাজের খাতিরেই অর্জন করতে হয়। কিন্তু সে। শিক্ষার বৈচিত্র্যেই যেহেতু ব্যাপক হা হালে কেলে, তাতিক শতের নির্দেশ নয়, তাই প্রকৃত বিজ্ঞানের শিক্ষা শিথর করা সূচেও এদেশের অধিকাংশ শিল্পীমূলক পায় না। এর ফলে এরা কখনো বা। দুর্ঘটনায় সহজে শিকার হয়, আবার কখনো বা বহু বিচিত্র ভুল অভ্যাস। ও ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়ে নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই ডেকে আনে। বিজ্ঞান শিক্ষার উপযোগিতা মধ্যবিত্ত সমাজেও যথেষ্ট। মধ্যবিত্ত ঘরের একজন কলা বিভাগের স্নাতক পরীক্ষায় ভালো ফলই করুক না কেন বিজ্ঞান বিষয়ে অত্যন্ত সাধারণ শিক্ষা যদি তার না থাকে তাহলে কেউ হবে, সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ। ধনী বা উচ্চবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা টাকার জোরে অনেক কিছুই করতে পারে, এমনকি দেশ-বিদেশে গিয়ে সভায় ডিগ্রি সংগ্রহ করাও কঠিন কিছু নয়।

বিজ্ঞান শিক্ষার নানা স্তর ও উপকারিতা: বিজ্ঞান শিক্ষার রয়েছে নানা স্তর। উচ্চতর, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক। বিজ্ঞান সম্পর্কে অন্তত প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন না করলে এ যুগে শিক্ষাই অসম্পূর্ণ থাকে। বাস্তগত জীবনে যেমন পারজীবনেও তেমনি মানুষ তার যথার্থ ভূমিকা পালনে অক্ষম হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ বিধিনিয়মগুলো যে জানে না, খাদ্যের গুণাগুণ বা রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা সম্পর্কে যার কোনো ধারণা নেই, নাগরিক হিসেবে নিশ্চয় সে দায়িত্বশীল হতে পারে না।। বিজ্ঞান সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান থাকলে নানাদিক দিয়ে সুবিধা। কেউ। রোগের কারণ্য বা সাময়িক রায়ু বেকেলো ফেল ভুল জায়গায় ডাকতে হয় না, অষ্টগ্রহ সংকলন বা স্বাইলাবে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণকে উপলক্ষ করে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে হয় না, ধূ তাবিজ বা মাদুলিকে সফল করে নিজেকে দৈবের হাতে সঁপে দিতে হয় না। এছাড়া বিজ্ঞান সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা আছে, অর্থাৎ যারা মাধ্যমিক পর্যায়ের বিজ্ঞান শিক্ষায় নিজেদের শিক্ষিত করেছেন তারা তো এক হিসেবে ভাগ্যবান। তারা বিশ্বজগতের মধ্যে নিয়মের সূত্র অনুধাবন করেন, জগৎ-সংসারের বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করেন এবং সবচেয়ে বড় কথা, জগৎ-সংসারের স্বরূপ উপলব্ধি আসতে হবে। বাপেরে অনেকখানি জানেন। উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। যারা যোগ্য এবং যথার্থই অগ্রহী, শুধু তারাই এই শিক্ষা লাভের সুযোগ পান। উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষা মানুষকে নব নব আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করে দেশ ও জাতি গঠনে বিরাট ভূমিকা রাখে।

বিজ্ঞান শিক্ষার প্রভাব ও সুফল: বিজ্ঞান শিক্ষা মানুষকে যুক্তিনিষ্ঠ ও বিচারশীল করে। অন্ধ আবেগ, ভুল বিশ্বাস ও সর্বনাশা মূর্খতার কবল থেকে বাঁচায়। বিজ্ঞান শিক্ষার গুণে মানুষের বুদ্ধির বিকাশ ঘটে, চিন্তা-ভাবনা ও বেখাশক্তির উদিত হয় এবং সবচেয়ে বড় কথা, সত্যোপলব্ধির পথে সে অনেক দূর এগিয়ে যায়। বিজ্ঞান শিক্ষা কুসংস্কারের বড় শত্রু। নজরে লেগে ছেলে রোগা হয় বা গাছ মরে যায়, সামান্য পরিমাণেও যারা বিজ্ঞান শিক্ষা অর্জন করেছেন, নিশ্চয় তারা এসব কুসংস্কারে কান দেন না, বিশ্বাস করেন না। এছাড়া দেহরক্ষার একটি স্থানে টিকিটিকি পড়লে অর্থাগম, হাঁটি-কাশির সাথে ভাইটি-অর্জনিত সম্পর্ক, স্বাস্থ্যেও প্রশ্ন বিষয়ে কোন দৈবীর দেব ক্ষমতা ইতাদি বিষয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার শিক্ষিতদের কাছে এর কোনো গুরুত্ব নেই। ধর্মের নামে গোঁড়ামিতে যারা প্রশ্রয় দেয়, প্রকৃত বিজ্ঞান শিক্ষা তাদেরও চেতনা জাগরণে সহায়তা করে।

সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ: বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য সরকারের উদ্যোগই প্রধান। কৃষকদেরকে, শ্রমিকদের বিজ্ঞান বিষয়ে। জ্ঞানদানে সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। বিভিন্ন বিজ্ঞান মেলার আয়োজন এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিজ্ঞান শিক্ষার অগ্রগতির জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সামাজিক সংগঠনগুলোরও এগিয়ে আসতে হবে।

উপসংহার: বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করে আগে আমাদের জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এদেশের কোটি কোটি মানুষ এখনো জগৎসংসার সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ। আমাদের মনে রাখতে হবে, জাতির বিপুলসংখ্যক মানুষকে বাদ দিয়ে মুষ্টিমেয় লোকের বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত হলে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই দেশের সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার পরিসর আরো বাড়াতে হবে এবং যথাসম্ভব আর্থিক দিক থেকে সহজলভ্য করে বিজ্ঞান শিক্ষাকে সকলের নাগালে আনতে হবে।

কম্পিউটার: বিজ্ঞানের বিস্ময়

অথবা, আধুনিক জীবনে কম্পিউটার

ভূমিকা: গ্রামভিত্তিক সমাজের স্থিতাবস্থাকে ভেঙে দিয়ে শিল্পবিপ্লব মানব সমাজের গঠন ও প্রকৃতিতে এনে দিয়েছিল এক বিপুলবিস্তারী ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন। মানুষ নিজেকে, নিজের শক্তির সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করল কলকারখানাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে। এর পরের ইতিহাস যন্ত্রমুগ্ধ আত্মপরিচয়ের ইতিহাস। আর এই পটভূমিতেই কম্পিউটারের আবিষ্কার ও বিকাশ। আজকের দিনে কম্পিউটার এক কম্পিউটারনির্ভর স্বয়ংক্রিয়তা একদিকে যেমন যন্ত্রের ওপর মানুষের নির্ভরণ ক্ষমতাকে বহুগুণিত করে মানুষের কর্মক্ষতাকে, উৎপাদন ক্ষমতাকে বিপুলভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে; অন্যদিকে প্রশাসনিক কাজকর্ম ও প্রয়োজনীয় হিসাব-নিকাশজাতীয় গতানুগতিক কাজকর্মের দায়িত্ব গ্রহণ করে – অনাবশ্যক মানসিক শ্রমকে ব্যবহারিক অর্থে অনেক সহজ করে তুলেছে।

কম্পিউটার কী: কম্পিউটার বলতে এমন একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র বোঝায়, যা অগণিত উপাত্ত গ্রহণ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিশ্লেষণ করে খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত দিতে পারে। 'কম্পিউটার' শব্দটি ইংরেজি এবং এর অর্থ হলো 'গণকযন্ত্র'। কম্পিউটার হিসাবের যন্ত্র হিসেবে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ জাতীয় অঙ্ক কষতে পারে। এছাড়া তথ্যাদির বিশ্লেষণ ও তুলনা করা এবং সিদ্ধান্ত দেওয়ার বিষয়াকার ক্ষমতা রয়েছে এই যন্ত্রটির। গণিত, যুক্তি ও সিদ্ধান্তমূলক কাজের সঙ্গে কম্পিউটারের সংযোগ। কাজের গতি, বিশুদ্ধতা ও নিরভরশীলতার দিক থেকে কম্পিউটারের ক্ষমতা মানুষের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত।

আবিষ্কার ও বিবর্তন: কম্পিউটারের প্রাথমিক ধারণা আসে চার্লস ব্যাবেজ পরিকল্পিত একটি গণকযন্ত্র থেকে। দিভূল এবং দ্রুত গণনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাবেজকে এই পরিকল্পনায় প্রেরণা যুগিয়েছিল। যোগ-বিয়োগ করতে সক্ষম গণনাযন্ত্র প্রথম তৈরি করেন গণিতবিদ ব্লেইজ পাসকেল ১৬৪২ সালে। ১৭৭১ সালে গডফ্রাইড লেবনিটজ প্রথম গুণ ও ভাগের ক্ষমতাসম্পন্ন যান্ত্রিক ক্যালকুলেটর তৈরি করেন। আধুনিক ক্যালকুলেটরের মূলনীতি ১৮১২ সালে চার্লস ব্যাবেজ প্রথম পরিকল্পনা করেন। ১৯৪৪ সালে হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয় ও আই.বি.এম. কোম্পানির যৌথ উদ্যোগে ইলেকট্রোমেকানিক্যাল কম্পিউটার তৈরির হয়। এরপর থেকে কম্পিউটারের গঠন ও প্রকৃতি অত্যন্ত দ্রুত বিবর্তিত হয়েছে। এর প্রয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে বহলগুণে। ইলেকট্রনিক্স শিল্পের দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কম্পিউটার হয়েছে সহজলভ্য। এখন বিজ্ঞানীর গবেষণাগার ছেড়ে সামাজিক জীবনে তার প্রতিষ্ঠা।

কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ: কম্পিউটারের ভেতরের গঠন, আকৃতি, কাজের গতি ইত্যাদি বিচারে একে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন: সপার কম্পিউটার, মেইনফ্রেম কম্পিউটার, মিনি কম্পিউটার ও মাইক্রো কম্পিউটার। গঠন ও আকৃতিগত পার্থক্য থাকলেও এদের মধ্যে মূলনীতিতে বিশেষ পার্থক্য নেই বললেই চলে। কম্পিউটার ছোট বা বড় আকারের হয়ে থাকে।

কম্পিউটারের ব্যবহার: কম্পিউটারের ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্র কোনো নির্দিষ্ট বিশেষ একটা জায়গায় সীমাবদ্ধ নয়। একদিকে কোনো প্রতিষ্ঠানে সমস্ত কর্মীর মাসিক বেতন, সেখানকার আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব-নিকাশ অথবা অন্যান্য গণনা কম্পিউটারের সাহায্যে করা যায়। কম্পিউটার এই বিপুল তথ্যভাণ্ডারকে নির্ভুলভাবে এবং সুসংঘদ্ধভাবে মনে রাখতে পারে। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার ব্যাপক। এর মাধ্যমে পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারণ ও জমা রাখা হচ্ছে। জমা রাখছে গবেষণাধর্মক কাজকর্মের তথ্য। মুদ্রণক্ষেত্রে অর্থাৎ বই ছাপার কাজে কম্পিউটার আজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে বিশাল কলেবরের বই-পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে আকাশে উড়ন্ত মহাকাশযান এবং তার গতিপথ নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তার জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এছাড়া বড় কলকারখানায় উৎপাদন, পরিরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ কম্পিউটারের সাহায়ে সহজে করা যায়। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার। বিভিন্ন ধরনের কাজে আরও সহজ এবং সাবলীল করে তুলেছে। কম্পিউটারের তথা সংরক্ষণ ক্ষমতা এবং নির্ভুল ও দ্রুত গণনার ক্ষমতা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার নানা গবেষণায় এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। কম্পিউটারচালিত রোবট কলকারখানায় গতানুগতিক ও কঠিন। মাপঝোক কাজকর্মের দায়িত্ব গ্রহণ করে সক্ষম হয়েছে।

কম্পিউটারের কুফল: অনেক সুফলের পাশাপাশি কম্পিউটারের কিছু কিছু কুফলও আছে। সাধারণভাবে কম্পিউটার মানবশক্তির বিকল্প; অসংখ্য মানুষ যে কাজ করে, কম্পিউটার তা একাই নিষ্পন্ন করে। কম্পিউটার প্রয়োগের ফলে সেসব মানুষ কর্মহীন হয়, সৃষ্টি হয় বেকার সমস্যা। বিশেষ করে দারিদ্র অনুন্নত দেশে কম্পিউটার এভাবে প্রবল সমস্যার সংকট সৃষ্টি করে থাকে। কম্পিউটার ব্যবহারকারী শারীরিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এর ব্যবহারের ফলে। এ যন্ত্র থেকে যে রশ্মি নির্গত হয় তা কখনো কখনো শরীরের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কম্পিউটারের দিকে অনেক সময় চাকরি-প্রার্থীর যোগাযোগ বা পাত্রপাত্রীর সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়। কিন্তু একজনের বিচার বা হৃদয়ধর্ম এতে নির্ধারিত করা দুঃসাধ্য। যান্ত্রিক ক্রটির জন্য কম্পিউটারের বর্তমানে অনেক সময় প্রবল ক্ষতি থেকে যায়। যান্ত্রিক গোলযোগ থাকায় অনেক সময় পরীক্ষার ফলাফলে মারাত্মক ক্রটি দেখা যায়; তাতে ছাত্রছাত্রীদের জীবনে ভাগ বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা থাকে। এমনিভাবে কম্পিউটারের নানা কুফল মানবজীবনকে বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত করে।

উপসংহার: আধুনিক জীবন ও বিজ্ঞানের সঙ্গে কম্পিউটার জড়িত থেকে মানুষের জন্য যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে, তা থেকে মানুষের কল্যাণ বয়ে আনতে হবে এই কম্পিউটারের মাধ্যমে। আমাদের সমস্যাসংকুল দেশে কম্পিউটার হয়তো অন্ধকার থেকে আলোতে আনার পথ দেখাবে। প্রকল্প বিশ্লেষণ, নানা নিয়ন্ত্রণ, বাজেট, অর্থনৈতিক, সামাজিক, কারিগরি ও শিল্পবাণিজ্য-সংক্রান্ত যেকোনো জটিল সমস্যার সমাধান দেয় এ কম্পিউটার। মানুষের চিন্তাধারার পরিকল্পনা বিশ্লেষণ, নিরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচ্ছুবিক অবদান রাখছে কম্পিউটার। তাই কম্পিউটারের সুফল ভোগ করার জন্য আমাদের তৎপর হওয়া প্রয়োজন।

চিঠিপত্র

৩ টি

ছুটির জন্য আবেদন

১২ জুলাই ২০২১
প্রধান শিক্ষক
মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা
মাডাম: শ্রেণিশিক্ষক, নবম শ্রেণি
বিষয়: অনুপস্থিতির কারণে ছুটি প্রদানের আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির একজন নিয়মিত শিক্ষার্থী। জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার কারণে গত ১৬ই মে ২০২১ থেকে ১৮ই মে ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ৩ (তিন) দিন আমি বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে পারিনি।
আমার অনিচ্ছাকৃত অনুপস্থিতি ওই ৩ দিনের ছুটি মঞ্জুর করতে আপনার সদয় মর্জি কামনা করছি।

বিনীত
মৌমিতা শবনম
শ্রেণি: নবম
রোল নং: ১২

সংযুক্তি
১. চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র

পাঠাগার স্থাপনের জন্য আবেদন

৪ জুলাই ২০২১
চেয়ারম্যান
ফুলকুড়ি ইউনিয়ন পরিষদ
বরগুনা সদর উপজেলা
বরগুনা
বিষয়: পাঠাগার স্থাপনের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

আমরা বরগুনা জেলার সদর উপজেলার ফুলকুড়ি ইউনিয়ন পরিষদের বাসিন্দা। আমাদের ইউনিয়নের বাসিন্দাদের সাক্ষরতার হার সন্তোষজনক। তাদের অনেকেই বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি চাকুরিসহ নানা পেশায় যুক্ত। বর্তমানে এই ইউনিয়নে যোগাযোগ ও অবকাঠামোগত অভূতপূর্ব উন্নয়নের কারণে নানা প্রকার সহশিক্ষাক্রম কর্মকাণ্ড এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এই ইউনিয়নে অব্যাহত শিক্ষা গ্রহণের জন্য কোনো পাঠাগার নেই। সেজন্য এই অঞ্চলের জনগণ নিয়মিতভাবে বই পাঠ করার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।
এই অবস্থায় ফুলকুড়ি ইউনিয়নে একটি পাঠাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত
ফুলকুড়ি ইউনিয়নবাসীর পক্ষে
মোঃ হাবিবুর রহমান
গ্রাম: ফুলকুড়ি, ডাকঘর: ফুলকুড়ি, জেলা: বরগুনা।

সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের আবেদন

১০ অক্টোবর ২০২১
প্রধান শিক্ষক
কুলকান্দি শামসুন্নাহার উচ্চ বিদ্যালয়
কুলকান্দি, ইসলামপুর
জামালপুর
বিষয়: বাংলা বিষয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের আবেদন।

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, গত ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানতে পারলাম, আপনার বিদ্যালয়ে বাংলা বিষয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। আমি উক্ত পদের একজন প্রার্থী। আমার ব্যক্তিগত তথ্য ও শিক্ষাগত যোগ্যতা নিম্নরূপ।

আমার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি।

নিবেদক
(স্বাক্ষর)রেখা আক্তার
৩৩ পশ্চিম নয়াপাড়া
জামালপুর সদর উপজেলা
জেলা: জামালপুর

ব্যক্তিগত তথ্য

১. নাম : রেখা আক্তার
২. মাতার নাম : খোদেজা বেগম
৩. পিতার নাম : একরামুল হক
৪. বর্তমান ঠিকানা : ৩৩ পশ্চিম নয়াপাড়া, জামালপুর সদর উপজেলা, জেলা: জামালপুর
৫. স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: হরিণধরা, ডাকঘর: কুলকান্দি, ইউনিয়ন: কুলকান্দি, উপজেলা: ইসলামপুর, জেলা: জামালপুর
৬. জন্ম তারিখ : ২৫ জুন ১৯৯৪
৭. জাতীয়তা : বাংলাদেশি
৮. ধর্ম : ইসলাম

শিক্ষাগত যোগ্যতা

পরীক্ষা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়	পাশের বছর	বিভাগ	ফলাফল
এসএসসি	শহিদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়	ঢাকা	২০১১	মানবিক	জিপিএ ৪.০০
এইচএসসি	ইসলামপুর ডিগ্রি কলেজ	ঢাকা	২০১৩	মানবিক	জিপিএ ৪.৫০
বিএ (সম্মান)	জাহেদা শফির মহিলা কলেজ	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	২০১৭	বাংলা	সিজিপিএ ৩.০০

সংযুক্তি

ক. সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের অনুলিপি
খ. জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি
গ. দুই কপি ছবি
ঘ. তিনশো টাকার পে-অর্ডার